শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ ও স্মৃতিশক্তির উন্নয়নে ছড়ার ভূমিকা

শিশু চারপাশে তার আপন জগৎ খুঁজে বেড়ায়। অনুভবে, দেখে এবং শোনে। শোনার প্রভাবটা দারুণ। এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেরাতে ফেরাতে বা হাত-পা নাড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়। নাম শুনলে নানাভাবে সাড়া দেয়। একবার ভেবে দেখুন নাম কি দেখা যায়? নাম তো শব্দমাত্র। শিশু যখন কান্না ছাড়া তেমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না তখনও অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ তাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ শ্রুতি শিশুর চিন্তাকে বিকশিত করছে, শ্রুতির মাধ্যমে মনের বিকাশ ঘটছে। শিশু হয়তো যে শব্দটা এইমাত্র শুনল তার কোনো অর্থই বুঝল না কিন্তু শব্দটার মধ্যে যে একটা সুর আছে, ছন্দ আছে, শ্রুতিমাধুর্য আছে সেটাই শিশুকে আকৃষ্ট করল। শুনতে শুনতে কোনো এক সময় সেই শ্রুতিমধুর শব্দটাও বোধগম্যের পর্যায়ে চলে আসে। চলে আসে নিজের আয়ত্তে। শিশুর অন্তরঙ্গ সহচর ছড়াকার আজিজুর রহমানের ছোট্ট একটি ছড়া বেশ মনে পড়ে

খায়নে খুকু গরম চা
ঐ পেকেছে করমচা।
গাছ তলাতে দৌড়ে যাই,
নুন ঝালে চল মেখে খাই।

কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিশুকে মনোযোগী করার, আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা ছড়া সাহিত্যের আছেÑ সেটা যুগে যুগে প্রমাণিত। এসব বিবেচনায় যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ভাষায় কোনো বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো বা পড়ালেখা শেখানোর একটি অন্যতম শিখন মাধ্যম হিসেবে ছড়া সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু ছড়া সাহিত্য শুধু পড়ালেখা শেখার মাধ্যম নয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনাচার শেখার একটা অতি পরিচিত এবং সহজলভ্য শিখন মাধ্যম যা প্রতিটি পরিবারে বা ঘরে ঘরে বিরাজ করে বিশ্বজুড়ে। ছোট বেলায় ঘুমপাড়ানির গল্প বা গান শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া নজিরবিহীন। সুপরিচিত এ ছড়াটি অনেক শুনেছি এবং অনেকেই শুনেছেন যেমনÑ

ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসী মোদের বাড়ি এসো।
মেজ নেই, সেজ নেই, খোকার চোখে বস ॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
আম-কাঁঠালের বাগিচা দেব ছায়ায় ঘুমায়ো ॥
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে।
দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে ॥

উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নি ধানের খই।
ধনী গাইয়ের দুধ দেব চিনি-পাতা দই ॥

শিশুরা শুধু খেয়ে বা ঘুমিয়ে তুষ্ট হয় না, তাদের আগ্রহ প্রবল; তারা পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে অনেক কিছু জানতে চায়। প্রকৃতিকে ধরে দেখাই শিশুর প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির কিছুটা পরিতৃপ্ত করতে কবি ফররুখ আহমেদ লিখেছেন

বকের বাসা বাঁশ বনে,
দল বেঁধে যায় কাশ বনে ॥
ভোর না হতে খাল বিলে
পাখায় পাখায় যায় মিলে ॥
নদীর ধারে ধ্যান করে,
সবাই সাধু জ্ঞান করে,
সুযোগ পেলে মাছ ধরে
বক উড়ে যায় চলমনে ॥

দেখুন বক, বাসা, কাশ বন, বাঁশ বন, মাছ, ধ্যান, জ্ঞান, খাল, বিল, নদী, ভোর, সাধু, পাখা উড়া, সুযোগ কত কিছুর সমাহার ছোট্ট একটি ছড়ায়।

শিশু অক্ষরজ্ঞান বা সাক্ষরতা অর্জনের আগে যা শুনে শুনে পড়তে শেখে তার নাম ছড়া। ছড়ার সুর ছন্দ তাল, অন্তমিল সবমিলিয়ে শ্রুতিমাধুর্য স্মরণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ চিন্তা করার ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ছড়া শিশুর মনে ছড়ায় বর্ণিত বিষয়ের অবয়ব তুলে ধরতে সহায়ক, চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে। এককথায় ছড়া শিশুর কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে, সেইসঙ্গে সৃজনক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে। যেমন আকাশ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে আমরা বলতে পারি, আ-দিয়ে আকাশ জুড়ে দৃষ্টি মেলার কল্প।

আকাশ বড় খোলা মেলা,
দিনের বেলা ঊষার মেলা।
রাতের বেলা চাঁদের হাসি,
তারা ভাসে রাশি রাশি।

আনন্দের সঙ্গে শিশু তার স্বাভাবিক ক্রিয়া, খেলাধুলা বা বড়দের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জেনে নিতে পারে। এখানে বিষয়ভিত্তিক ছড়া অনেক বেশি সহায়ক। সুতরাং ছড়া মানে শুধু ঘুম পাড়ানির ছড়া নয়। যেমনÑ

অ-অঙ্ক বড় মজার খেলা।
মজায় মজায় কাটে বেলা।
জগৎটাকে জানতে ভাই
মজার খেলা অঙ্ক চাই।
যেমন ঐ, ঐরাবতের মস্ত দাঁত
মুখজুড়ে লম্বা হাত।
ঐরাবতের চারটি পা
হাত ঘুরিয়ে করে হা।

প্রতিটি অক্ষর দিয়ে শিশুদের জন্য আমাদের কোনো কোনো ছড়াকার ছড়া লিখেছেন, সে সব খুঁজে খুঁজে শিশুদের সংস্পর্শে নিয়ে আসা বড়দের দায়িত্ব। শিশু যখন অক্ষর জ্ঞান লাভ করে এবং একের পর এক অক্ষর সাজিয়ে শব্দ তৈরি করে, তখন থেকেই শিশুর চিন্তাশক্তি বিকাশের ধারাবাহিকতা এবং ক্রমে উন্নয়ন দৃশ্যমান হতে থাকে; কিন্তু চিন্তাশক্তির উদ্রেক ঘটে পড়তে বা লিখতে শেখারও আগে। তাই শিশুকে সম্বোধন, শিশুর সঙ্গে কথোপকথন, আদর সম্ভাষণ শ্রুতিমধুর হওয়া বেশ ফলপ্রদ। দুনিয়াজুড়ে শিক্ষার কিছু স্বীকৃত উপকরণ আছে। তন্মধ্যে পাঠ্যপুস্তক অন্যতম। তাই পাঠ্যপুস্তককে হতে হয় সর্বজনগ্রাহ্য। আমরা জানি, পুস্তক মানেই পাঠ করার উপকরণ কিন্তু সব পুস্তক পাঠ্যপুস্তক নয় কেন? আবার এমন প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে সব পাঠ্যপুস্তক কি পাঠের উপযোগী? অথবা শিশুদের পাঠ্যপুস্তক কি লক্ষ্য পূরণে সহায়ক? অর্থাৎ শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তক কি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করছে? শিশু শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তককে, পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদিকে সত্য বলে জানে, অনুসরণ করে, সবচেয়ে বড় কথা জীবন চলার পথে ওই আদলে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করে। তাই পাঠ্যপুস্তকে কি পড়ছে, কাকে পড়ছে তার পরিচয় জানার দাবি রাখে, দাবি রাখে পরিপ্রেক্ষিত জানারও। শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে, তাদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে রচিত হতে হবে পাঠ্যপুস্তক। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা তা পাঠ করবে কেন?

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক দিবস পালিত হয়ে আসছে ১ জানুয়ারি। এ উৎসবের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি অনেক আনন্দের। নতুন বই নতুন আশা, পড়াশোনায় ভালোবাসা এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তক কি শিশুদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপনে সহায়ক? বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবতে হবে। আইনস্টাইনের মতে, 'শিক্ষা হচ্ছে চিন্তা বাড়ানোর জন্য মনের প্রশিক্ষণ, অনেক কিছু শেখা নয়।' আমাদের প্রত্যাশা, শিশুরা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে চিন্তা বাড়ানোর জন্য মনের প্রশিক্ষণটি পাবে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তককে বিষয়টি ধারণ করতে হবে, যা খুবই যৌক্তিক। পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। দেশব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ পাঠ্যপুস্তক। তাই বলে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র শিক্ষা উপকরণ নয়। আমরা এটাও জানি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কারণ আমাদের শিশু-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়, পরিবেশ, আবিষ্কার, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে। বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো কি উৎকৃষ্ট মান নির্দেশ করছে? প্রাথমিক শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রারম্ভিক ভিত্তি। শিক্ষার প্রারম্ভিক ভিত্তি দুর্বল হলে তার প্রভাব উচ্চশিক্ষাকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে। বাংলাদেশে বিরাজমান শিশু শিক্ষার মান বিষয়ে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা পড়তেই পারে না। যদি ফিরে তাকাই ২০১৫ সালের ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনের দিকে, দেখতে পাই বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় এবং ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আরও মনে পড়ছে, আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রুম টু রিড' বাংলাদেশের শিশুদের পঠন দক্ষতার ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে ছিল। সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শব্দ বুঝে উচ্চারণ করে মিনিটে গড়ে ৩৩টি শব্দের বেশি পড়তে পারে না। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষার এই ধাপে শব্দ বুঝে মাতৃভাষা উচ্চারণ করে পড়তে পারার হার মিনিটে ৪৫ থেকে ৬০টি শব্দ (৩০/০৯/১৯ প্রথম আলো)।

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন স্কুলের শিশুদের হাতে বই তুলে দেওয়া একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ১

জানুয়ারি সরকার বই উৎসবের ঘোষণা দিয়েছে। আগে প্রতি বছরের শুরুতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদের বিনামূল্যে এক সেট বই দেওয়া হতো; কিন্তু বর্তমানে আরও সম্প্রসারিত করে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়। ফলে প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি, মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে।

মানুষ ভাষা শেখে-শুনে-বলে, অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, ইঙ্গিত, পড়ালেখা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, আঁকাআঁকি বা চিত্রলিপি ব্যবহারসহ বিভিন্ন আঙ্গিকে। ভাষা মনের ভাব প্রকাশে একটি অতুলনীয় শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা সাধারণত ভাষা শিখে থাকি কথা বলা, দেখা, শোনা ও লেখাপড়ার মাধ্যমে। পড়ালেখা চর্চার প্রাথমিক হাতিয়ার হচ্ছে প্রত্যেক ভাষার বাক্য শেখার, শব্দ শেখার, অক্ষর শেখার ভিন্ন ভিন্ন বিভিন্ন উপকরণ বা সুসমন্বিত উপকরণ। অর্থাৎ ভাষা শিক্ষাও উপকরণ নির্ভর একদম প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই। আবার শেখার প্রারম্ভিক স্তরও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণনির্ভর, বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধি বিকাশে, চিন্তার উপকরণ জোগাতে। এই সুসমন্বিত চেতনা ভিত্তিতেই শিশুর জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে খেলনা আদিকাল থেকেই। খেলনা শুধু বিনোদন উপকরণ নয়, বহুমুখী শিক্ষা উপকরণও। উপকরণ শুধু কোনো কিছু অবহিত করে না, নতুন চিন্তারও উদ্রেক ঘটায়। শিশুর জন্য আনন্দদায়ক শিক্ষা উপকরণ বড় বেশি প্রয়োজন। এসব উপকরণ হতে পারে পুস্তক, চার্ট, কার্ড, অডিও, ভিডিও বা যে কোনো আঙ্গিকে।

ভাষা জীবনের জীবনীশক্তি। আমাদের বাংলা ভাষা অনেক বছরের পুরোনো সমৃদ্ধ ভাষা। সে হিসেবে আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিশীলিত ভাষা শেখার, চর্চার, পড়াশোনা করার প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে। এ কারণে বিরাট সংখ্যক শিশু-কিশোর এমনকি বয়স্ক নিরক্ষরদের কাছে সাক্ষরতা অর্জন, চর্চা বা পড়ালেখার মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষাচর্চা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। আকর্ষণীয় উপকরণ এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আমি এর বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পেয়েছি দীর্ঘদিন নিরক্ষর শিশু-কিশোর এবং বয়স্কদের সাক্ষরতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে।

কার্যকর আকর্ষণীয় ছোট্ট একটা উপকরণ দিয়ে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়। যেসব উপকরণ শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে সে সব উপকরণ প্রয়োজন। এ সময় শিশু-কিশোরদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা চলে না। তাদের মধ্যে পড়াশোনার অভ্যাস এবং বোধশক্তি জাগিয়ে তোলাটাই শিক্ষার আসল পুঁজি। বাধ্যবাধকতা এ পর্যায়ে জেদ তৈরি করে। এই জেদ থেকে তৈরি হয় ভীতি। ভীতি শিশু-কিশোরদের পিছিয়ে দেয়। শিশুদের সিলেবাস বাধ্যবাধকতাবিহীন। আর শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার্য সিলেবাস বললে কেমন যেন একটা ভীতি এবং সীমাবদ্ধতা এসে যায়। শিশুদের আকৃষ্ট করতে হয় সিলেবাস দিয়ে নয়, সিলেবাসের বাইরে নিয়ে। শিশু-কিশোরদের সামনে উপস্থাপিত উপকরণটা যদি নিত্যব্যবহার্য বিরাজমান বিষয়ের সঙ্গে খানিকটা সম্পৃক্ত করিয়ে দেয় বাকিটুকু শিক্ষার্থীরা নিজেরা রপ্ত করে নিতে পারে। ভাষার মূল বিষয়গুলোর সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিলে শিক্ষার্থীরা ভাষার মূল সুর আয়ত্তে আনতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যে অক্ষর উপস্থাপন করা হচ্ছে সে অক্ষর মিশে আছে এমন পরিচিত বিষয় সুর ছন্দে গেঁথে দিলে সে অক্ষর শিক্ষার্থীদের মনেও গেঁথে যায় বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে।

বাক্যই ভাষার প্রাণ। ছন্দবদ্ধ বাক্যে বিষয়ের বর্ণনা সে সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আকৃতি। ছবি শিশু-কিশোরদের বিমোহিত করে, খেলার ছলে পড়া, অন্যের মুখে শোনা, অক্ষর চেনা, বাক্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও বিষয়ভিত্তিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়তা করে অর্থাৎ পুরো বিষয়ের একটা অবয়ব চেতনায় ছাপ ফেলে, স্মৃতিকে সমৃদ্ধ

করে। সবচেয়ে বড় কথা, শিশু-কিশোরদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে, জানার আগ্রহ বাড়ায়। উদ্রেক ঘটে চিন্তাশক্তির। এক কথায় খুলে যায় ভাবনার দুয়ার। এভাবেই ঘটে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও স্মৃতিশক্তির উন্নয়ন।

একটি আদর্শ শিক্ষা উপকরণ স্মৃতিশক্তির উন্নয়ন ও চিন্তার বিকাশে সহায়ক। এ পর্যায়ে এটাই শিশু-কিশোরদের শিক্ষার মূল অনুপ্রেরণা। এ অনুপ্রেরণাই শিশু কিশোরদের এগিয়ে নেয় জীবন জগতের আকর্ষণে পড়াশোনার বিশাল জগতে। শিশু-কিশোরদের উৎসুক মনে আকর্ষণ সৃষ্টিই একটি আদর্শ শিক্ষা উপকরণ বা পাঠ্যপুস্তকের প্রাণকথা। শিশু-কিশোররা চির সুন্দর, চির অম্লান, নিরলস এবং গতিময়। এ গতিময়তাই শিশু-কিশোরদের নিরন্তর শক্তির উৎস। বড়দের দায়িত্ব বিদ্যমান গতিময়তাকে কার্যকরভাবে সঠিক পথে প্রবাহিত হতে সহায়তা করা, অনুপ্রেরণা দেওয়া, মনের মাঝে আনন্দ বিচরণের ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া। এরকম সহায়তার কার্যকর উপায় হচ্ছে শিশু-কিশোরদের মনে আনন্দ দেয় এমন শিক্ষা উপকরণ বা পাঠ্যপুস্তক। এমন কিছু শিক্ষা উপকরণ তাদের হাতের নাগালে দিতে হবে যেগুলো থেকে আনন্দ সহকারে শেখা যায়। সিলেবাসের বাধ্যবাধকতা দিয়ে নয়। শিশুকাল শেখার কাল। শিশুরা নতুন কিছু রপ্ত করতে মোটেই আলসেমি করে না। আসল কথা হলো বিষয়বস্তু ভালো লাগাতে হয়। শিশু-কিশোররা শেখে খেলার ছলে।

আমাদের লক্ষ্যÑ ভালো থাকা, শিক্ষাকে ভালোর পথে পরিচালনা করা, সব কিছু ভালো রাখা। এ প্রসঙ্গে আহসান হাবীবের ‘ভালো’ ছড়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক।

এক ছিল ভালো তার সব কিছু ভালো,
ভালো তাই সকলেই বলে তাকে ভালো।
ভালো হয়ে থাকে আর ভালো হয়ে চলে,
ভালো কথা শোনে আর ভালো কথা বলে।
যাকে পায় তাকে বলে, ভালো আছ ভাই?
চিঠি লেখে, ভালো আছি, আর ভালো চাই।
সকলকে ভালো করে ভালোবাসা দিয়ে,
ভালো আরো ভালো হয় ভালোবাসা নিয়ে।
ভালো হয়ে সকলেই বলে, বেশ বেশ।
সকলেই ভালো, তাই ভালো এই দেশ।

শিশু-কিশোররা যতই শ্রেণি গুনতে থাকে তাদের বিষয়-আশয়গুলো ততই সিলেবাসবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ হতে থাকে। নিজেদের সিলেবাসবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করার আগের সময়টুকু সত্যিই বেশ উপভোগ্য। বহুমুখী শিখন প্রক্রিয়ার একটি হলো ছড়া ও ছন্দ। ছড়া ও ছন্দ ব্যবহার করে শিশুকে বর্ণমালা, শব্দ এবং নানা বিষয়ে পাঠদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত আইডিয়াল প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বহুমুখী শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য ছড়ার মাধ্যমে ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করছে এমন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন সেভ দ্য চিলড্রেন (ইউএসএ), প্লান বাংলাদেশ, ফুলকি, এফআইভিডিবি ও ব্র্যাক তাদের পরিচালিত শিশু-শিখন কার্যক্রমে দীর্ঘদিন যাবৎ ছড়ার ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও উল্লেখ করতে পারি ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের একটি অমর ছড়া, যা ১০০ বছরের ওপর বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির পাঠ্য ছিল; তা উদ্ধৃত করেই লেখাটির ইতি টানছি।

পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল ॥
রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল ॥
গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন ॥
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির ॥
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ ॥

শিশুদের দুরন্ত এবং উপভোগ্য সময়টুকু আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক মজাদার সহায়ক আদর্শ শিক্ষা উপকরণের সংস্পর্শ পেলে। ছড়া পড়ে বা ছড়া শুনে এমন শিশুর পক্ষে স্ব-শিখনে মনোনিবেশ করা সহজ হয় এবং শিখন ত্বরান্বিত হয়। ছড়ার সাহায্যে বর্ণমালা, শব্দ ও বাক্য শেখানো একটি বহুল পরিচিত পদ্ধতি। আত্মপরিচয়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, সংবেদনশীলতা, জীবপ্রেম, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ও ছড়ার মাধ্যমে শেখানো সহজ হয়। মজাদার ছড়া এই বিবেচনায় অনন্য। তাই আমাদের শিশুদের জন্য রচিত শিক্ষা উপকরণ হয়ে উঠুক শিশুবান্ধব ও আনন্দদায়ক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শাওয়াল খান
লেখক ও শিক্ষাকর্মী

শিশুর বিকাশে পঠনদক্ষতা ও শিশুবোধক বই কতটা প্রাসঙ্গিক?

শিশুর বিকাশ
শাওয়াল খান

শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যথাযথ শিক্ষা ছাড়া শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থা চারটি প্রধান স্তম্ভ নির্দেশ করেÑ জানতে শেখা, করতে শেখা, বাঁচতে শেখা ও মিলেমিশে বাস করতে শেখা। মানুষ সারাজীবন যা কিছু শেখে, তার সবই এ চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে শেখে
জগৎজুড়ে বিশাল এক সম্ভাবনার নাম মানবশিশু। এই সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করার জন্য একান্ত প্রয়োজন শিশুর

বিকাশ, শিশুর শিক্ষা। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিশুর বিকাশে প্রয়োজন শিশুবান্ধব শিক্ষা, শিশুবোধক বই, শিশুতোষ শিক্ষা উপকরণ। শিশুর মনের উৎকর্ষ সাধনই শিশু বিকাশের মূল কথা। শিশুবোধক বই শিশুকে আকৃষ্ট করে, পঠনে অভ্যস্ত করে। পঠনদক্ষতা শিশুর শিক্ষা বিকাশে অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের পঠনদক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ কতটা অবারিত? শিশুবোধক বই কতটা সহজলভ্য?

শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যথাযথ শিক্ষা ছাড়া শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থা চারটি প্রধান স্তম্ভ নির্দেশ করেÑ জানতে শেখা, করতে শেখা, বাঁচতে শেখা ও মিলেমিশে বাস করতে শেখা। মানুষ সারাজীবন যা কিছু শেখে, তার সবই এ চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে শেখে। সুতরাং শিশু তো ব্যতিক্রম কিছু নয়। এই শিখনের ভেতর দিয়ে শিশু শুধু তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে তা নয়, সৃষ্টি করবে বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও কাজ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি চিন্তার জগৎকে বাস্তবতার নিরিখে সমৃদ্ধিশালী ও মজবুত করার ক্ষমতা। শিশুর কল্পনাশক্তি অসাধারণ; কারণ শিশু উন্মুক্ত মান চিন্তা করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে নিঃসংকোচে। এই চিন্তা করার শক্তিই শিশুর রঙিন কল্পনার গোড়ার কথা। শিশুর পঠনদক্ষতা শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, শিক্ষাকে প্রসারিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির বিকাশ না ঘটলে চিন্তাশক্তি স্তিমিত হয়ে যায়; চিন্তাশক্তি দিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। অর্থাৎ কাক্সিক্ষত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না।

শিশু প্রতিনিয়ত শিখে চলে। কারণ জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, নিজের চেষ্টায় এবং অন্যের সহযোগিতায় শিশুকে সবকিছু ক্রমে ক্রমে রপ্ত করতে হয়। শিক্ষা এখন একটি পদ্ধতিগত ব্যাপার। এই পদ্ধতিতে আসতে হলে কিছু আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন করতে হয়। শিশুও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং শিশুকেও নিতে হয় শিক্ষার প্রাথমিক কিছু প্রস্তুতি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত হওয়ার আগে শিশুবোধক বিভিন্ন পরিচিত বিষয়ের জীব, জন্তু, পশুপাখি, ফুলফল, জামা, জুতা, খেলনা, মজাদার খাবারদাবার, ঘরবাড়ি, নৌকা-গাড়ি, বই-খাতা, রংতুলি নানাবিধ জিনিসপত্রের ছবির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সর্বোপরি পড়ে শুনানো এবং বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি। এই বর্ণ পরিচিতির মধ্য দিয়ে শিশু পড়ার অভ্যাস রপ্ত করে। এই অভ্যাস থেকেই গড়ে ওঠে পঠন অভ্যাস। সেই অভ্যাস থেকেই ধীরে ধীরে পঠনদক্ষতা বাড়ে। এ দক্ষতাই শিশুকে পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করে, জ্ঞানভা-ার সমৃদ্ধ করে।

শিশুকে কেন্দ্র করে শিক্ষার কার্যক্রম প্রণীত হলে তাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে। এ কার্যক্রমের প্রতিটি উপাংশও শিশুর মনোপযোগী করে রচনা হয় বলে এর প্রতিটি কর্মতৎপরতায় শিশুরা আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্যরে কথা বিবেচনা করে তাদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়, তা-ই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এ ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে সহজে ও আনন্দচিত্তে শিক্ষার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। রুশো, ফ্রয়েবল, জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষাদার্শনিক শিশুর সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে না বুঝে শেখার প্রবণতা থাকে না। এ শিক্ষায় পদ্ধতি হিসেবে দলীয় কর্মকা- আবিষ্কার ও সমস্যা সমাধান ইত্যাদি প্রয়োগের প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষার্থীর বিকাশ ও শিখনকে কার্যকর করতে মনোবিজ্ঞানীরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর ভূমিকাকে প্রধান হিসেবে ধরে শিশুর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। এতে শিক্ষা হয় আনন্দদায়ক, দীর্ঘস্থায়ী ও বৈচিত্র্যময়। এ কারণে শিশুর সহজাত আকর্ষণের প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষাক্রম তৈরি ও শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। শিশুদের জন্য প্রণয়ন

করা হয় শিশুবোধক আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, যাতে শিশুরা নিজেদের আগ্রহের বিষয় খুঁজে পায়। এতে শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ে; শিশু চিন্তাচেতনার স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শেখে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুই শিখনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষকের ভূমিকা এক্ষেত্রে হয় একজন সহযোগী, বন্ধু ও সাহায্যকারীর। এই পদ্ধতিতে শিশুর পঠনদক্ষতা স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায়। এই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ফ্রয়েবল, মন্তেসরি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক শিক্ষাবিদ মনীষী তাদের উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষার পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। মন্তেসরির মতে, শিশু স্বাধীনতা উপভোগ করে, তার পছন্দসই খেলাধুলা করে, শাসনের পরিবর্তে শৃঙ্খলা মানতে শিখবে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তি নিকেতনে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে এসে তাদের আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতাচর্চা এবং প্রকৃতির মাঝে বসে শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা আজ সম্পূর্ণভাবে শিশুর তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রয়োজন, আগ্রহ ও সামর্থ্য। গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর নিজের প্রয়োজন, আগ্রহ ও সামর্থ্য ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। বয়স্কদের প্রয়োজনের বিচারেই শিশুর শিক্ষা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হতো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান সর্বাগ্রে। এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাণই হলো শিশুর প্রয়োজন, তার অবয়ব হলো শিশুর সক্রিয় অভিজ্ঞতা এবং শিশুর আগ্রহ ও সামর্থ্য হলো তার সাংগঠনিক শক্তি।

শিশু বিকাশের জন্য শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাই যথাযথ বলা হচ্ছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার মনোভাবের মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠলে তাদের মধ্যে হিংসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, নীচতা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। অপরদিকে সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সংঘবদ্ধতা আনতে এবং সুষম স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তা গঠনে সাহায্য করে। তাই সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ পদ্ধতিই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। অতীতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে শিশুকে শিশু বলেই মনে করা হয় এবং তার অভিজ্ঞতা ও বিকাশমুখিতা সবই বয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে গণ্য করা হয়। এ কারণেই বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে তার জীবনধারার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। এক কথায় শিক্ষাজীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। শিশুশিক্ষা বিষয়ে বিশ শতকের ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ইত্যাদি একুশ শতকে আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। শিশুদের শিক্ষার যে-কোনো কাজ পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং বাস্তবায়নে এসব দিক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশে শিক্ষক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তিসহ শিক্ষাবিষয়ক কর্মে নিয়োজিত সবাইকে শিশুশিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্ক সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং তা চর্চায় মনোযোগী হওয়া এখন সময়ের দাবি। তবে এ কথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এখনও আমাদের শিশুশিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি। শিশু বা শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ও যুগোপযোগী করার আয়োজন শুরু হয়েছে মাত্র।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতোই শিশুদের ওপর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অপরিসীম। জন্মের পর শিশু নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবেশ, পরিবারের সঙ্গে বসবাস ও খাপ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আচরণ ও অভ্যাস অর্জন করে। এসব আচরণ,

অভ্যাস, মূল্যবোধ আবার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও গঠনে পরিবারের পরই সমাজ ও শিক্ষাঙ্গণের স্থান। শিশুর আনুষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ হয় বিদ্যালয় পরিবেশের মাধ্যমে। তাই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রভাব খুব বেশি। শিশুর পঠনদক্ষতাও এতে প্রভাবিত হয়।

পড়ালেখা বা লেখাপড়া বা পড়াশোনা শব্দটা যেভাবেই বলি না কেন, পড়া বা পাঠ করা কথাটা এসেই যায়। পড়ার সঙ্গে প্রথম বই বা প্রাইমার কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পড়ালেখার সূচনা পাঠ বা প্রারম্ভিক পাঠই হলো প্রথম বই বা প্রাইমার। এই প্রাইমার হতে হবে শিশুবোধক। প্রথম বই অবশ্য বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য রচিত হয়। প্রাইমার শুধু ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিক পথ দেখিয়ে দেয়। আর তা হলো পড়া ও লেখার পথ। পড়া এবং লেখার দক্ষতা বিনির্মাণ করাই প্রাইমারের মূল উদ্দেশ্য। শিশু প্রথমত শুনতে শুনতে শেখে। বই পড়লে, পড়ে বুঝলে এবং বুঝে লিখতে পারলে সে শিক্ষা আরও পোক্ত হয়। ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষায় প্রথমে প্রাইমার রামসুন্দর বসাক রচিত 'আদি বাল্যশিক্ষা'Ñ যা অষ্টাদশ এবং প্রাক-ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মূলত শিশুদের বর্ণ শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত বর্ণপরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সহজ পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শিশু ও বয়স্কদের বর্ণ শেখার জন্য পঠিত ও ব্যবহৃত হতো। সময়ের বিবর্তনে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাইমারের প্রকরণ এবং প্রয়োগেরও বিবর্তন ঘটেছে। এখন সুনর্দিষ্ট পাঠক্রমভিত্তিক ও পদ্ধতিনির্ভর এবং শিক্ষার্থীর মনন, পারিপার্শ্বিকতা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রাইমার রচিত হয়ে থাকে। ইদানীং সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমভিত্তিক প্রাইমার ছাড়াও হরেকরকম সহায়ক বই শিশুদের জন্য প্রকাশ করা হয়। সেসব বইয়ে বিভিন্ন রঙিন ছবি এবং মজাদার ছড়া, গল্প থাকেÑ যা শিশুদের পঠনদক্ষতা বাড়াতে সহায়ক। তবে আমাদের দেশে সেসব বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে সহায়ক সামগ্রীর সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সহায়ক পুস্তক, অনুশীলন খাতা, চার্ট, পোস্টার, কার্ড, গ্লোব, মডেল এবং শিক্ষকের আলোচনা-পর্যালোচনা। কোনো লিখিত বষয় সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ভাষার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ হয়, তাকে পড়া বা পঠন হিসেবে অভিহিত করা হয়। অক্ষর চিনে ভাষায় লিখিত রূপ দেওয়া, মনের অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থ অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে পঠন বা পড়া সম্পন্ন হয়। পড়ার মূল বিষয় হলো দেখা, মনের চোখ দিয়ে দেখা, অনুধাবন করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা। পড়া বা পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ হয়; তাকে ঘটনার উৎস খুঁজে বের করতে অনুপ্রাণিত করে। পড়ার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য শিশুকে অক্ষর পরিচিতি প্রদান করতে হয়; তার শব্দভা-ার বৃদ্ধি করতে হয়। এটা করা সম্ভব বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি ও শব্দানুক্রমিক উভয় পদ্ধতিতে।

শিশুশিক্ষাকে আকর্ষণীয়, কার্যকর ও আনন্দদায়ক করতে শিশুশিক্ষা বইয়ের অনেক বেশি অলংকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। ছবি দেখে দেখে শিশুরা বাস্তব জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সম্পৃক্তি ঘটাতে সক্ষম। পৃথবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের বইকে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করা যায়, সে বিষয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে।

খেলা শিশুর জীবনে নির্মল আনন্দের পাঠ। ছবিসংবলিত বই খেলার উপকরণ হিসেবেও পরিচিত। শিশুর আনন্দ উপভোগের মাধ্যম খেলা। আর রূপকথার গল্প, সে তো আরও আনন্দের। শিশুরা রূপকথার গল্প শুনতে যেমন ভালোবাসে আবার পড়তে শিখলে পড়তেও ভালোবাসে। শিশুদের আগ্রহ দেখে মনে হয়, রূপকথার গল্প হয়তো শিশুদের কারণেই যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। বিশ্বজুড়ে বিশ্ব শিশু বই দিবসের জন্মও রূপকথার রাজা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান

অ্যান্ডারসনের জন্মদিনকে ঘিরে। আর বিশ্বজুড়ে বইয়ের প্রতি ভালোবাসার দিন বিশ্ব শিশু বই দিবস। এক কথায় নিশ্চুপ বসে থাকা বইয়ের কী অসাধারণ ক্ষমতা, ভাবতে অবাক লাগে।

বিশ্ব শিশু বই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে পক্ষকালব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় শিশু-কিশোরদের জন্য মজার সব আয়োজন থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এই দিবসটি এখনও ব্যাপক পরিচিতি পায়নি। দিবসটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের খুদে পাঠক শিশু-কিশোররা উপকৃত হতো। বাংলা একাডেমির আয়োজনে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে, যা এখন চলছে। এই মেলায়ও শিশুদের নিয়ে লেখা বই থাকে। তবে এখানে শিশুবোধক বই-ই মুখ্য নয়। এমনিতেই আমাদের দেশে শিশুবোধক বইয়ের অভাব আছে। সেই অভাব দূর করতে শিশুবোধক বই বেশি বেশি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিতে হবে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়ে। আমরা সেই দিন গুনছি, বাংলাদেশ কবে কখন শিশুবোধক বই বিষয়ে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; শিশুর পঠন দক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুবিষয়ক কর্মসূচি আরও কার্যকর করে। বাংলাদেশের শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। শিশুরা এগিয়ে যাক।

শাওয়াল খান
লেখক ও শিক্ষাকর্মী

শিশুর মানস গড়নে ছড়া-পদ্য ॥ হেনরী গোমেজ

শিশু সাহিত্যের অন্য যেকোনো শাখার তুলনায় ছড়া সাহিত্য খুব সংবেদনশীল এবং তাৎক্ষণিক অনুভূতিতে ঢেউ তুলতে সক্ষম। শিশুতোষ ছড়ার মূল প্রাণ আপাতত অর্থহীন শব্দের ব্যঞ্জনা। যে বিষয় শিশু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বুঝবে না, আকারে-ইঙ্গিতেও বোঝানো সহজ নয়; সে বিষয়ও শিশু অনুপ্রাসের মর্মে গেঁথে নিতে পারে খুব সহজে। এর জন্য অভিভাবক কি শিক্ষককে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হয় না। অল্প কথায় শিশুমনের আবেগ অনুভূতি, বিশ্বচরাচরের নানা সংলগ্ন ও অসংলগ্ন বিষয়ে শিশুমনে যে প্রশ্ন সতত জাগরুক, তার উত্তর আপাতত সচেতন অভিভাবক মহলে থাকে না। শিশুমনের যে আকাঙ্ক্ষা, তার পরিতৃপ্তি অভিভাবকমহল হয়তো বস্তুগত কোনো বিষয়ের সাহায্যে দিতে চান; কিন্তু সে বস্তুগত বিষয় উত্তর এনে দেওয়ার পরিবর্তে শিশুমনকে বিষিয়ে তুলতে পারে। কারণ শিশুর মানসিক পরিচর্যাকারীকে অবশ্যই শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝতে সমর্থ হতে হবে। ব্যত্যয়ে মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে হয়তো সুই খুঁজে তুলে আনা সম্ভব, কিন্তু শিশুমনের নাগাল পাওয়া সুদূর পরাহত। শিশুমনের কৌতূহল মেটানোর জন্য চাই তার মনোলোভা শব্দচয়নে আকাঙ্ক্ষার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা। আর তা অনেকটা সম্ভব শিশুতোষ ছড়ার আশ্রয়ে।

বাংলা সাহিত্যে শিশুতোষ ছড়ার প্রসঙ্গ এলেই যে নামটি সবার আগে পাঠকমনে ভেসে ওঠে, সে নাম সম্ভবত সুকুমার রায়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন, বন্দেআলী মিয়া, রোকুনুজ্জামান দাদা ভাই, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সুকুমার বড়ুয়ার নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়। সুকুমার রায় থেকে শুরু করে আজকের তরুণতর ছড়াকারও শিশুতোষ ছড়া রচনার ক্ষেত্রে শিশুর মনস্তত্ত্বিক দিকটি সবার আগে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেন। শিশুমনের বাসনা উপলব্ধি করে, তাকে শিশুর মনতোষময় ভাষা-শৈলীতে উপস্থাপন করা ছড়াকারের মৌল দায়। সে দায় পুরণে ছড়াকার কতটা প্রতীজ্ঞাবদ্ধ, তাও বিবেচনার বিষয়। শিশুতোষ ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য—সেখানে

উদ্ভট ও যুক্তিহীন বিষয়ের অবতারণা করা এবং সে অযৌক্তিক বিষয়কে নানা রঙে রঞ্জিত করে শিশু মনে আলোড়ন তোলাই ছিল বাংলা ছড়ার প্রাথমিক রূপকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজও তা প্রবহমান।

শিশুর মন না বোঝা গেলে তার মনোলোভা শব্দচয়ন সব সময় সম্ভব হয় না। শিশুতোষ ছড়া ও পদ্যের ক্ষেত্রে সুকুমার রায় বিষয় নির্বাচনে খামখেয়ালিপনাকে যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছেন, ততটা বস্তুসত্যকে গুরুত্ব দেননি। তৎকালীন মানবসমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতির চরম প্রভাব না পড়ায় সে সময়ের শিশুমন রূপকথার অযৌক্তি ও উদ্ভট বিষয়কেই নিজেদের কল্পজগতের বিষয় বলে ধরে নিত। ফলে সে সময়ের ছড়াও মানব জীবনের নানা অসঙ্গতি মানবায়নের চেয়ে স্বপ্নায়ণের দিকে বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুমনের নানা প্রশ্নকে উপজীব্য করে বস্তুসত্য ও কল্পজগতের সমন্বয়ে সমন্বয়বাদী চেতনার আলোকে ‘ছুটি’, ‘আমাদের ছোটনদী’, ‘মাঝী’, ‘বীরপুরুষ’, ‘আষাঢ়’সহ সংখ্যাধিক ছড়া ও কিশোর কবিতায় শিশুমনের অলিগলি ঘুরে ফিরে দেখেছেন। এসব ছড়া-কবিতা-পদ্যে বিধি ও রীতির শৃঙ্খল থেকে সাময়িক মুক্তির আনন্দে হৃদয়ের উদ্বেল তরঙ্গমালাকে একটি চাঞ্চল্যের অমোঘ বন্ধনে নিবন্ধন করার লক্ষ্যে নিসর্গ থেকে শিশুর মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত বিচরণ করেছেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার একজন নীতিবাদী সাহিত্যিক। ফলে তার শিশুতোষ রচনায়ও তার নীতিবাদী প্রভাব পড়েছে। তার বিখ্যাত পদ্য ‘আমার পণ’। এপদ্যে তিনি একটি আদর্শ শিশুর প্রভাত থেকে সারাদিনের কর্মযজ্ঞের ভেতর সুস্থ ও রুচিশীল একটি পরিবেশের পক্ষে সংকল্পের কথা বুনন করেছেন।

শিশু সাহিত্যে যার অবদান প্রবাদতুল্য তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তার ‘আমি হব,’ ‘রণ সঙ্গীত’, ‘মা’, ‘সংকল্প’ ছড়া ও শিশুতোষ পদ্য এবং সঙ্গীত কেবল শিশুমনকে আন্দোলিত করে যে, তা নয়, সঙ্গে বড়দেরও বিমোহিত করে। ‘আমি হব’ ছড়ার যে পণ, তা একটি শিশুর বেড়ে ওঠার পথে অমূল্য পাথেয়। রণসঙ্গীতের যেঅংশটুকু শিশুমনকে আলোড়িত সে অংশটুকুতে শিশুমনে উদ্দীপনা জাগানোর পক্ষে মহৌষধ। ‘মা’ পদ্যে চিরকালীন মায়ের ছবি আঁকা হয়েছে। সন্তানের সুখে-দুখে মা-ই শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংকল্প শিশুমনের দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতার সঙ্গে স্বপ্নের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি অভিযাত্রীর তীব্র মনোবাসনাকে শৈল্পিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি।

জসীমউদ্‌দীন পল্লীকবি বলে খ্যাত হলেও শিশুমনকে পল্লীবাসীর চোখ দিয়ে বিচার করেননি। পরিপূর্ণ মানবমনের পরিচর্য পাওয়া যায় তার শিশুতোষ ছড়া-কবিতায়। ‘সবার সুখে’, ‘রাখাল ছেলে’, ‘নিমন্ত্রণ’, ‘এত হাসি কোথায় পেলে’ প্রভৃতি ছড়া ও পদ্যে শিশুমনের আবেগ অনুভূতিকে ব্যক্তিবিশেষের আবেগ অনুভূতির সীমা ছাড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক আবেগ ও অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেছেন। ‘সবার সুখে’ ছড়ায় যেমন সাম্যবাদের কথা বলেছেন, ‘রাখাল ছেলে’ পদ্যে যেমন আবহমান গ্রাম বাঙলার নিসর্গরাজিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, ‘নিমন্ত্রণ’ পদ্যে যেমন হৃদয়ের ঔদার্য্যের পরিচয় বিধৃত করেছেন, তেমনি ‘এত হাসি কোথায় পেলে’ ছড়ায় শিশুমনের জিজ্ঞাসার সঙ্গে প্রকৃতির প্রশ্নশীল আচরণকেও একাত্ম করে দেখেছেন।

আহসান হাবীব মূলত কবি। কিন্তু ছড়া ও শিশুতোষ কবিতায়ও সিদ্ধহস্ত। ‘ছড়া’, ‘স্বদেশ’, ‘রূপকথা’, ‘জোনাকিরা’ তার সুখ্যাত ছড়া ও শিশুতোষ কবিতা ও পদ্য। ‘ছড়া’ নামক ছড়াটি ছয়মাত্রিক, দুইপর্বের অন্ত্যমিল যুক্ত। এটি ছড়া হলেও ছড়ার একরৈখিক চেতনাকে ছাড়িয়ে বহুরৈখিক বিষয়ের সন্নিবেশ এখানে ঘটেছে। স্বদেশ মূলত বাংলাদেশের নৈসর্গিক

দৃশ্যরাজির চিত্রায়ণ। জোনাকিরা শিশুমনের অদম্য কৌতুহল ও প্রশ্নের একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ঋদ্ধ ক্যানভাস। এ ছড়ায় আহসান হাবীব শিশুমনের অলিতে গলিতে ঘুরেফিরে শিশুমনের নানা খোঁজখবরকে তুলে এনেছেন জোনাকিরা আলোর প্রতীকে।

শিশু মনের আবেগকে ভিত্তি করে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এর 'কে', সুনির্মল বসুর 'সব পেয়েছির দেশে', 'সবার আমি ছাত্র', কুসুম কুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে', অতুল প্রসাদ সেনের 'বাংলা ভাষা', রজনী কান্ত সেনের 'স্বাধীনতার সুখ' কায়কোবাদের 'বঙ্গভূমি' ও 'বঙ্গভাষা', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা-দিদি', গোলাম মোস্তফার 'প্রার্থনা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'পারিব না', কাজী কাদের নেওয়াজ এর 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা', ফজলুল করিম-এর 'তুলনা', বন্দে আলী মিয়ার 'আমাদের গ্রাম', 'পাখি', সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের 'কোন দেশে', 'পাল্কীর গান', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কাজের লোক', ফজলুর রহমানের 'গ্রীষ্মের দুপুরে', সৈয়দ আলী আহসানের 'দেশের জন্য', ফররুখ আহমদ-এর 'বৃষ্টির ছড়া', সুফিয়া কামালের 'প্রার্থনা', 'হেমন্ত', শামসুর রাহমানের 'ট্রেন', 'সাইক্লোন', সৈয়দ শামসুল হকের 'আমাদের এই বাংলাদেশ', আল মাহমুদ-এর 'ভর দুপুরে', রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর 'চাষী', সানাউল হকের 'মুক্তির ছড়া', আসাদ চৌধুরীর 'জানাজানি', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'হবে তবু শিখতে', সুকুমার বড়-য়ার 'মুক্তিসেনা', প্রভৃতি ছড়া ও পদ্যের বিষয়বস্তু ও ছন্দের কারুকার্য শিশুকিশোর নয় কেবল, বয়স্কদেরও আনন্দ দানের পাশাপাশি হিতোপদেশ কিংবা বিধি নিষেধের সাধারণ জ্ঞান দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব ছড়া ও পদ্যে দেশের নৈসর্গিক দৃশ্যরাজি যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি বর্ণনা করা হয়েছে শিশুমনের নানা প্রশ্নের সব বিচিত্র উত্তর ও সম্পূরক ও পরিপুরক প্রশ্নের। শিশুর চরিত্রগঠনে এসব ছড়া পদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনার সময়, স্বদেশের প্রকৃতি, স্বাধীনতা, জ্ঞানার্জনে ক্ষেত্রে চরাচরের নানা বিষয় ও অনুষঙ্গে অবদান এসব ছড়া ও পদ্যে সাবলিলভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এসব ছড়া শিশুমনকে খুব সহজে আলোড়িত করে। এসব ছড়া ও শিশুতোষ পদ্যের শব্দে শব্দে শিশুর মনের অলি-গলি চেনা যায়। ফলে শিশু এসব ছড়া পাঠান্তে নিজের মনের ভেতর যে প্রশ্নশীল জগৎ থাকে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পায়।

শিশুর গল্পের দেশ, দেশের গল্পকথা

একসময় এদেশের শিশুরা মায়ের মুখে, নানি-দাদির মুখে মুখে নানারকম গল্প শুনে বেড়ে উঠত। সব গল্পই যে খুব প্রাসঙ্গিক, যৌক্তিক, শিশুবান্ধব, সংবেদনশীল কিংবা শিক্ষণীয় ছিল এমন নয়। সেসব গল্প বইয়ে ছাপা নয়; মুখে মুখেই তারা চড়ে বেড়িয়েছে যুগের পর যুগ। কিন্তু খুব সংগোপনে মুখে মুখে থাকা সেসব গল্পের দিন যে কখন ফুরিয়ে গেছে, তা হয়তো আমরা কেউই সেভাবে টের পাইনি।

এইসময়ে এসে নানি-দাদি কিংবা মায়েদের মুখে মুখে চড়ে বেড়ানো সেসব গল্প শিশুদের শোনাতে গেলে অনেকেই দ্বিধান্বিত হতে পারেন। কারণ এখন সন্তান লালন-পালনের যে কাঠামো তার সঙ্গে সেসব গল্প সংঘাত তৈরি করতে পারে। এইসময়ে এসে তাই বদলে গেছে শিশুদের গল্প এবং গল্প বলার ধরনও। মুখে মুখে বলা গল্পের দিন তো ফুরিয়েছেই। কালো কালো অক্ষরে লেখা কাগজে ছাপা গল্পও যেন এখন আর শিশুদের জন্য যথেষ্ট নয়। যুগের

হাওয়ায় শিশুদের গল্প বা শিশু সাহিত্যকে এখন লড়াই করতে হচ্ছে টেলিভিশন, ইন্টারনেটসহ শক্তিশালী আরও নানা বিনোদন মাধ্যমের সঙ্গে। শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের এ লড়াইয়ের ইতিবাচক-নেতিবাচক দুই দিকই আছে। এখন শিশুদের জন্য এমন অনেক গল্পের বই পাওয়া যায় যেসব অনেক বর্ণিল, সহজ ভাষায় লেখা এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো শিশুর মননগঠন উপযোগী। আজ যে শিশুরা এসব পড়ছে, তার মা-বাবার প্রজন্মও হয়তো বাঘ কিংবা অন্য অনেক প্রাণীকে বধ করার গল্প শুনেই বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আজকের অনেক শিশুই পড়ছে প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের গল্প। প্রকাশানার উপস্থাপনা এবং বিষয়বস্তুতে এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্যই ইতিবাচক। অন্যদিকে, এ যুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী বিনোদন মাধ্যমের সর্বগ্রাসী থাবা খুবলে খাচ্ছে এদেশের শিশুদের মনোজগৎও। টেলিভিশনে কার্টুন-অ্যানিমেশনের সিরিজ, নানা বাহারি বিজ্ঞাপন কিংবা ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে শিশুদের হাতছানি দেওয়া নানা আয়োজনে; আমাদের শিশুদের মন কেড়ে নিচ্ছে ভিন দেশের সংস্কৃতি। বিনোদন মাধ্যমের কল্যাণে একটু বড় হতে না হতেই, এদেশের শিশুদের কাছেও জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠছে ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, রাপানজেল কিংবা বার্বি ডল। ফলে একটা সময়ের পর আগের পুরনো গল্পগুলোকে হয়তো শিশুরা অপ্রয়োজনীয় ভাবছে, কোনোভাবেই সেসবের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারছে না। আবার ব্যাটম্যান-সুপারম্যান-রাপানজেলদের গল্পকথাকে এই শিশুরা কখনোই নিজেদের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতেও পারে না।

এরকম একটা পর্বান্তরের সময়ে দাঁড়িয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে, 'অসংবেদনশীল', 'পুরনো' বা 'বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন' বলে আমরা যে গল্পগুলোকে সরিয়ে রাখছি এবং আধুনিক বলে যেসব গ্রহণ করছি, যোগ-বিয়োগে এর ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে। খুব সরল একটা হিসাব করে বলে দেওয়া যায়, শেকড়ের সঙ্গে যোগসূত্রহীন উদ্বাস্তু-মনের ভবিষ্যৎ-মানুষ তৈরির আশঙ্কা। সমাধান একটাই, যোগাযোগের সুতোটা ছিঁড়তে না দেওয়াÑ আজ যে বেড়ে উঠছে তাকেও পুরনোর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'ম্যান দ্য আর্টিস্ট' শিরোনামে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'জন্তুর জন্মস্থান থাকে, মানুষের থাকে দেশ; তবে সেই দেশ সৃজন করতে হয়।' শিশু সাহিত্যের কথাই বলি কিংবা শিশু শিক্ষা; রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজনীয়। এইসময়ের শিশুদের মননে কীভাবে নিজের দেশটা সৃজন হবে সেটা ভাবা দরকার। আগেকার রূপকথায় কিংবা মা-বোনের, মাসি-পিসির, নানি-দাদির মুখে মুখে চড়ে বেড়ানো গল্পকথায় আর যাই থাকুক না থাকুক, নিজের দেশের ছবিটা ছিলÑ নিজের বন-পাহাড়, ঘাস-ফুল-নদী, পাখপাখালি, বাঘ-হরিণ-কুমিরের কথা ছিল, নিজেদের লোক চরিত্রগুলো ছিল। রূপকথা গল্পকথার আধো আধো আলোছায়ায় শৈশবেই শিশু মনে সেই ছবিগুলো আঁকা হয়ে যেত।

আজকের শিশুরা সেই পুরনোকে আর সমসাময়িক বাস্তব বলে ভাববে, সেটা সম্ভব নয়; বরং তার সঙ্গে সে তুলনা করবে নিজের সময়ের। এ জন্য পুরনোকে নতুন রূপে হাজির করতে হবে। এখনকার আধুনিক নাগরিক সভ্যতার সামাজিক বাস্তবতায় কীভাবে পুরনো রূপকথা-গল্পকথার প্রাসঙ্গিক অভিযোজন ঘটানো যায় সেই পথ খুঁজতে হবে। এভাবে এই সময়ের শিশুদের কাছে দেশের ছবিমাখা রূপকথা-গল্পকথা তুলে দিতে পারলে, ধীরে ধীরে হয়তো ওরা নিজেদেরও নতুনভাবে আবিষ্কার করে ফেলবে। ওদেরই কেউ কেউ সেই নব আবিষ্কৃত পাটাতনে দাঁড়িয়ে মনের ভেতর দেশ নামে সেই গাছের নতুন নতুন শাখা-প্রশাখায় চড়ে বেড়াবে অবলীলায়; ফুল ফোটাবে, ফল ফলাবে।

শিশুদের নিয়ে এমন ভাবনাগুলো বাস্তবের ঘরদোরে চর্চা করাটা কঠিন। এ জন্য প্রয়োজন শিশুদের প্রতি মনোযোগ, শিশুদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং শিশুদের জন্য বিস্তর সময় বরাদ্দ করা। আর এই ভাবনাগুলোকে আমাদের মনন থেকে ছাপাখানা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কাজটা মনে হয় আরও কঠিন। আশার কথা হলো কেউ কেউ কঠিনেরেই ভালোবাসে। শিশুদের প্রকাশনা জগতের এমন এক ইতিবাচক উদ্যোগ 'ইকরিমিকরি প্রকাশনী'। শিশুদের গল্পকথা-রূপকথা নিয়ে যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম, সে সব চিন্তা প্রয়োগ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় ইকরিমিকরি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'জিরোধনী' বইটিতে।

জিরোধনী লোকগল্প। গল্পটি সংগ্রহ করেছেন নিখিল চন্দ্র দাস। ইকরিমিকরির অন্যান্য বইয়ের মতো এটিও গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছবির বই। ছবি এঁকেছেন সংগ্রাহক নিজেই। পটচিত্রের ধারায় আঁকা ছবিগুলো গল্পটিকে যেন সৃষ্টি করেছে নতুন করে। পাতায় পাতায় আঁকা ভীষণ রঙিন ছবিগুলো শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে সহজেই। শিল্পী এস এম সুলতানের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করা এবং সরাসরি তার কাছে ছবি আঁকার তালিম নেওয়া নিখিল চন্দ্র দাস জন্মেছেন নড়াইলেই। সংগ্রহ তার নেশা। গল্প সংগ্রহ সেই নেশারই একটা অংশ।

কাহিনি বিচারে জিরোধনী অন্যসব লোকগল্পের মতোই আটপৌরে বাঙালি জীবনের টুকরো ছবি। জিরোধনী একটা ছোট্ট মেয়ে। তার ভাইয়ের নাম হিরোধনী। সমাজের প্রথাগত চর্চায় ছেলেসন্তান প্রীতির একটা নমুনা লক্ষ করা যায় গল্পের শুরুতেই। মা হিরোধনীকে বেশি আদর করে। জিরোধনীকে বকাঝকা করে। একদিন মায়ের বকা খেয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বিশাল এক পদ্মপুকুরের পাড়ে বসে বসে কাঁদতে থাকে। তার কান্না শুনে ভীষণ মায়া হয় এক ঝিনুকের। সেই ঝিনুকটা জিরোধনীকে নিজের ভেতরে আশ্রয় দেয়। পরের ঘটনাপ্রবাহে জিরোধনী আশ্রয় পায় ঐ গাঁয়েরই এক মালি বুড়ির কাছে। বুড়ি অবশ্য জেনেবুঝে তাকে আশ্রয় দেয় না। পদ্মফুল তুলতে গিয়ে সে বিরাটাকায় ঝিনুকটা দেখতে পায়। আর সেটা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এই মালি বুড়ির মাধ্যমে বদলে যায় জিরোধনীর জীবন। জিরোধনী হয়ে যায় পদ্মরানী। প্রচলিত লোকগল্পের মতোই পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে এ গল্প। একালে যে শিশুটি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তালি বাজিয়ে বেড়ে উঠছে, তার কাছে এত ছোট জিরোধনীর রানী হয়ে যাওয়া নিয়ে খটকা লাগতেই পারে। এখানে দায় আছে বড়দের। জিরোধনী যে অবাস্তব কোনো চরিত্র নয়, সেকাল থেকে একালে অনেক মেয়েরাই যে বাল্যবিবাহের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে আজকের শিশুটা পর্যন্ত পৌঁছেছে এটা তাকে জানানো-বোঝানোর দায়িত্ব তো বড়দেরই।

চেনা গল্প, জানা চরিত্রের জিরোধনী বইটি উপস্থাপনের মুন্সিয়ানায় এবং গুণগত মানের কারণে হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক, নতুন এবং প্রাণবন্ত। লোকগল্প ফিরিয়ে আনার মতোই, পটচিত্রের ঐতিহ্যবাহী ধারাকেও জিইয়ে তুলে শিশু পাঠকদের সামনে হাজির করেছে এই গল্পের বইটি। এমন সব গল্প পড়ে, পটের ছবি দেখে বেড়ে উঠতে থাকলে শিশুদের মনে দেশের গল্পকথা, দেশের রূপছবিটা গাঁথা হয়ে যাবে। তখন ওরা বিশ্বভ্রমণে বেরোলে আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। ওরা ডিজনি ওয়ার্ল্ডের রূপকথায় ঘুরে বেড়াবে ঠিকই, কিন্তু সেটা নেহায়েত পর্যটক হিসেবে, বাঁধা পড়ে যাওয়ার নিমিত্তে নয়।

সাদিকা রুমন : শিশু সাহিত্যিক ও গণমাধ্যমকর্মী

শিশুসাহিত্য ও আমাদের দায়বদ্ধতা

রাশেদ রউফ

শিশুসাহিত্য শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, আর 'ছড়াসাহিত্য' শব্দটি প্রথম আসে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কলমে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নতুন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শতসহস্র বছর পূর্বে যেমন ছিল আজোও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন তেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।

এই নবীন চিরত্বের ধারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে!'

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। অন্যদিকে এর ঠিক পাঁচ বছর পর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' সংকলনের ভূমিকায় 'ছড়াসাহিত্য' ও 'শিশুসাহিত্য' শব্দ দু'টি উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সেখানে তিনি বলেছেন :

'বাঙালি শিশুর ও বাঙালি জননীর স্বাভাবিক চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু না থাকুক, কিন্তু সেই জননীর ও তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সামাজিক চরিত্রে বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে বাসনিবন্ধন যে অনন্যসাধারণত্ব, যে বৈশিষ্ট্য আছে, এই ছড়াসাহিত্যে তাহারও পরিচয় না পাওয়া যাইবে, এমন নহে!....

বাঙালি জাতির সমগ্র সাহিত্যটাতেই বাঙালির সেই গৃহের বিবিধ চিত্র নানা রঙে চিত্রিত হইয়াছে এবং স্বভাবের তুলিকা যেন সেই রঙ ফলাইবার জন্য, কোনো কৃত্রিম উপকরণের সাহায্য লয় নাই; স্বভাবের ভাণ্ডার হইতেই সেই রঙগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি আধুনিক যুগের কৃত্রিম শিক্ষার প্রভাবে নির্মিত সাহিত্যের কথা বলিতেছি না; বাঙালির অকৃত্রিম প্রাচীন নিজস¦ সাহিত্যের কথা বলিতেছি; এবং এই অকৃত্রিমতার হিসেবে বাঙালির গ্রাম্য-সাহিত্য, বিশেষত বাঙালির শিশুসাহিত্য বা ছড়াসাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্বতোভাবে অতুলনীয়।'

তাই 'শিশুসাহিত্য' শব্দটির প্রথম ব্যবহার নিয়ে যে সব অভিমত প্রচলিত আছে, সেসব অভিমত আমরা উপরে উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিবেচনা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে এখানেও পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হয়।

শিশুসাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে নানাজন নানা রকম অভিমত প্রদান করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই ছোটোদের জন্য লেখা সাহিত্যকে 'শিশুসাহিত্য' নামে অভিহিত করেছেন। লীলা মজুমদার 'শিশুসাহিত্য' বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন গভীরভাবে। তিনি বলেছেন :

'ইংরেজিতে যখন বলা হয় বুক্‌স ফর চিলড্রেন, কিংবা জুভেনাইল লিটারেচার; সকলেই বুঝে নেয়, ঐসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু সাহিত্য বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ আপত্তি করেন, বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে কিশোর। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য

দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশুসাহিত্য বলতে ৫-১৬ পর্যন্ত সব পাঠকের কথাই মনে করি।' অন্যদিকে চিত্রা দেব বলেছেন : 'শিশুসাহিত্যের পরিধি নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণত চার-পাঁচ বছরের শিশু থেকে চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরদের পাঠোপযোগী সাহিত্যকেই শিশু সাহিত্য বলা হয়। ড. মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী তাঁর 'শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ-সংজ্ঞা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে শিশু ও কিশোর মনের জগৎ আলাদা। তাদের জন্য লেখা সাহিত্যের জগৎও স্বতন্ত্র। অধিকাংশ সাহিত্যিক এই স্বাতন্ত্র্য মেনেই সচেতনভাবে শিশু সাহিত্য ও কিশোর সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। আবার অনেকের রচনায় সমস্ত ছোটোদের জগৎটাকেই আকর্ষণ করবার উপযুক্ত উপাদান চোখে পড়ে। তাই বলা যায়, যে সমস্ত লেখা পড়ে শিশু ও কিশোররা আনন্দ পায়, জাগতিক শিক্ষা পায় এবং মানসিক পরিপূর্ণতা লাভ করে, তা সামগ্রিকভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্য সংজ্ঞায় নিরূপিত হতে পারে। তবে শিশুসাহিত্য কথাটি যেহেতু আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই সাধারণভাবে গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।' যদিও শিশুসাহিত্য রচনা করা হয় আমাদের সমাজের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মজা ও আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তবু তার মধ্যে শিক্ষারও একটা সংযোগ থাকে। সে কারণে হরেন ঘটক বলেছেন, 'শুধু তাকে আনন্দ দেওয়াই নয়, শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস এবং বিশ্ব-প্রকৃতিকে জানবার আগ্রহী করে তোলবার উদ্দেশ্যও এতে বর্তমান'। ফলে সুখলতা রাও 'শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও রুচি' বিষয়ে লিখেছেন : 'শিশু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শিশুর সরল মনে যে ছবি, যে-শিক্ষা, যে-আদর্শ পৌঁছায়, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষা দীক্ষা, এমনকি রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করে। বিষয়টিকে আরো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত। শিশুসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "আমাদের সকলেরই আজ একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সাহিত্যকে অভিন্ন করে না তুলতে পারলে, শিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্যও হবে পঙ্গু। এই শিক্ষার মানে 'সদা সত্য কথা কহিবে' এবং 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। এ শিক্ষার মানে শিশু মনে যতগুলো সদ্বৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা। এই সদ্বৃত্তির মধ্যে আছে ভদ্রতা, সমবেদনা ও করুণা, আছে উচ্চাকাক্সক্ষা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতা, আছে দয়া, দাক্ষিণ্য ও মমতা, আছে মানবতাবোধ, আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সন্ধান। তেমনি আছে রসনাভূতি কাব্যবোধ ও সাহিত্যপ্রীতি, আছে অনুসন্ধিৎসা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছুকে বিচার করবার ক্ষমতা।"

এখানে বলে রাখা দরকার যে, বাঙালি শিশুর জন্য শিশুপাঠ কেমন হওয়া উচিত-সেই পথ প্রথম দেখালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৮৪৯ সালে 'শিশু শিক্ষা' গ্রন্থমালা লিখে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' এই লাইনটি 'শিশু শিক্ষা' প্রথম ভাগের 'প্রভাতবর্ণন নামে চিরকালের শিশু কবিতার অংশ। 'লেখাপড়া করে যে/গাড়িঘোড়া চড়ে সে-এক সময়ে ছোটোদের কাছে এই আপ্তবাক্যটি আওড়ানো হতো। সময়ের পরিবর্তনে আজ এই বাক্যটি ভুলে যেতে বসলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটি ছিল বিদ্যা গ্রহণ বিষয়ে উজ্জীবনের মূলমন্ত্র। এই বইয়ে প্রচুর নীতিশিক্ষা রয়েছে। তবে কোনো বিশেষ ধর্মীয় নীতিবোধের চেয়ে সর্বজনীন মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুসাহিত্য সে হিসেবে আনন্দ আর শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'শিশু শিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায়- অর্থাৎ আনন্দ-সেই বস্তু জুগিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি'। বিষয়টাকে আরো খোলাসা করেছেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'শিশুসাহিত্য আনন্দের আশ্রয়ে চরিত্রগঠন ও শুভবুদ্ধির সঞ্চার মাতৃ¯œেহ, পিতৃনিয়ন্ত্রণ এবং খেলার সাথীর সাহচর্য- এই তিনটির উপরেই নির্ভর করে'। শিশুসাহিত্য গবেষকদের নানা মতকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে শিশুসাহিত্য হলো ছোটোদের এক রঙিন জগৎ। তাদের মনে বিশুদ্ধ আনন্দরস সঞ্চারের জন্য যে সাহিত্য রচনা করা হয়। যে রচনা পড়ে ছোটোরা মজা পায়, আনন্দ পায়, পরিতৃপ্ত হয়। তাকে তারা সহজেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নেয়। ছ্োেটোদের চঞ্চল, কল্পনাপ্রবণ ও জিজ্ঞাসু মনকে অনুষঙ্গ করে সাহিত্য রচনা করেন লেখকরা। হাসি, কৌতুক, মজা বা আনন্দ গ্রহণের অন্তরালে ছোটোরা অনায়াসে পেয়ে যায় জাগতিক জ্ঞান, বুদ্ধি-যুক্তি ও চিন্তার চমৎকার উপাদান। এই জ্ঞান বা শিক্ষা জটিল নয়, কঠিন নয়, জগৎ ও পরিবেশ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান। শিশু সাহিত্যিকদের এসব রচনা থেকে জীবনকে দেখবে এবং অনিসন্ধিৎসু মন দিয়ে খুঁজে পাবে জীবনের বিচিত্র রূপ।

শিশুসাহিত্যের পাঠক কেবল কি ছোটোরাই?

সময়ের বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ বদলে যায় চারপাশের জগৎ ও জীবন। পাল্টে যায় সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যের ধারা। এই বদলে যাওয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুসাহিত্যও ধীরে ধীরে পাল্টে ফেলছে। রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিবর্তন ঘটছে তার গতি-প্রকৃতি। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রকরণ, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধারার রচনা এবং নির্মাণ হচ্ছে নতুন আঙ্গিক। এজন্য পূর্বের ধ্যান ধারণারও পরিবর্তন ঘটছে। শিশুসাহিত্য একান্তভাবে ছোটোদের জন্য লেখা হলেও সব বয়সের পাঠকের কাছেই তা পরম আস্বাদ্য। বুদ্ধদেব বসু অনেক আগেই বলেছেন, ‘এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, কেননা তা সত্যিকার সাহিত্য হলে বড়রাও তাতে আনন্দ পান’। ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শিশু সাহিত্যের ভোক্তা-বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন : বর্তমান কালের ছোটোদের বই অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করাও উপভোগ করে থাকেন। কথাটাকে একটু বিস্তার করা দরকার। শিশুসাহিত্যে বড় দুটো শ্রেণি পাওয়া যায়। তার একটা হলো একান্তভাবে, বিশুদ্ধরূপে নাবালক সেব্য, যেমন যোগীন্দ্রনাথের, উপেন্দ্র কিশোরের রচনাবলি, আর অন্যটা হলো সেই জাতের বই, যাতে বুদ্ধির পরিণতিক্রমে ইঙ্গিতের গভীরতা বাড়ে, যেমন ক্যারলের অ্যালিস-কাহিনী, অ্যান্ডারসনের রূপকথা, বাংলা ভাষায় ‘বুড়ো আংলা’ ‘আবোল তাবোল। যাদের মনের এখনও দাঁত ওঠেনি, একেবারে তাদেরই জন্য প্রথম শ্রেণির রচনা। তাদের ঠিক উপযোগী হলেই তা সার্থক হলো : কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা, বিশেষ অর্থে, শিশু পাঠ্য থেকেও, হয়ে ওঠে বড় অর্থে সাহিত্য, শিল্প কর্ম, অর্থাৎ লেখক ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে সকলের বই লিখে ফেলেন। বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক শিশুসাহিত্য, যা বয়স্করাও উপভোগ করেন। তা এ দুয়ের কোনো শ্রেণিতেই পড়ে না, খুব ছোটোদের খাদ্য এটা নয় বরং বলা যায় কিশোর সাহিত্য আর বয়স্কদের যখন ভালো লাগে, তখন এই কারণেই লাগে যে লেখক তা-ই ইচ্ছে করেছিলেন, অনেক সময় বোঝা যায় যে লেখক যদিও মুখ্যত বা নামত ছোটোদের জন্য লিখেছেন, তবু সাবালক পাঠকও তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত ছিল না।

আশা গঙ্গোপাধ্যায়ও ‘শিশুসাহিত্যের স্বরূপ’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘যথার্থ শিশু সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব্ব বয়সের নরনারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়, বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে- কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মতো শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবেই।’ অতএব, আমরা বলতে পারি, যে কোনো মহৎ সাহিত্য যেমন সরস ও সুস্বাদু হবার পাশাপাশি বৃহত্তর জগতের সন্ধান দেয়, তেমনি যথার্থ শিশুসাহিত্যে আনন্দরসের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় চারপাশের জগৎ ও জীবন। এটি চিরায়ত সাহিত্য। সব শ্রেণির পাঠক এর ভোক্তা।

শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা তথা শিশুসাহিত্যে কেমন হওয়া উচিত?

শুধু শিশুসাহিত্য নয়, যে কোনো ধরনের রচনার বড় একটি গুণ হলো সহজ ও সরল রচনারীতি। শিশুসাহিত্যে এই সারল্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। ইচ্ছে করলেই লেখাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় না। তার জন্যও প্রয়োজন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে

সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

রচনার সহজ রীতির এই বৈশিষ্ট্যটি লেখকের মানসিকতা, উপলব্ধি ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। সহজ ও সরল রীতি আয়ত্ত করা কঠিন একটা কাজ। এই কঠিন কাজটি নিজের কব্জায় আনার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। অবিরাম চর্চার মধ্য দিয়ে লেখকরা তাঁদের রচনাকে সরল, সহজ, সরস ও আকর্ষণীয় করে তোলেন।

ম্যাক্সিম গোর্কির একটা বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন ঞড় ংঁপপবংংভঁষষু পৎবধঃব ভরপঃরড়হ ধহফ বফঁপধঃরাব ষরঃবৎধঃঁৎব ভড়ৎ পযরষফৎবহ বি হববফ ঃড় ভড়ষষড়রিহম; ভরৎংঃ, ঃধষবহঃ পধঢ়ধনষব ড়ভ ৎিরঃরহম ংরসঢ়ষু, রহঃবৎবংঃরহমষু ধহফ সবধহরহমভঁষষু; ঃযবহ বফরঃড়ৎং ড়ভ পঁষঃঁৎব, রিঃয ংঁভভরপরবহঃ চড়ষরঃরপধষ ধহফ ষরঃবৎধৎু ঃৎধরহরহম ধহফ ভরহধষষু, ঃযব ঃবপযহরপধষ ভধপরষরঃরবং ঃড় মঁধৎধহঃবব ঃরসবষু ঢ়ঁনষরপধঃরড়হ ধহফ ফঁব য়ঁধষরঃু ড়ভ নড়ড়শং ভড়ৎ পযরষফবৎহ.

ছোটোদের জন্য গল্প উপন্যাস ও শিক্ষামূলক সাহিত্য রচনায় আমাদের সাফল্য নির্ভর করে কিসের ওপর? প্রথমে আমাদের প্রয়োজন সেইসব প্রতিভাবান লেখক, যাঁরা সহজ, সরস ও অর্থপূর্ণ রচনা তৈরির ক্ষমতা রাখেন। তারপর চাই সংস্কৃতিমান সম্পাদক, যাদের সাহিত্যও রাজনীতিতে যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকে। এবং সর্বোপরি প্রয়োজন শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলি যথাসময়ে এবং যথোচিত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ করে প্রকাশের নিশ্চয়তা বিধানের কারিগরি সুযোগ-সুবিধা।

ম্যাক্সিম গোর্কি ঝরসঢ়ষু, ওহঃবৎবংঃরহমষু এবং গবধহরহমভঁষষু-এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন। শিশুসাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সহজ ও আকর্ষণীয় করা। কেননা, সহজ সরল না হলে ছোটোদের বুঝতে কষ্ট হবে, আর আকর্ষণীয় না হলে পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ জন্মাবে না। ছোটোদের মনে কৌতূহল সঞ্চার করা এবং তাদের নরম, কোমল ও আনন্দময় মনকে উজ্জীবিত করার জন্য সহজ ও আকর্ষণীয় রচনার বিকল্প নেই। এর মধ্যেই নিহিত আছে চিরায়ত সাহিত্যগুণ। শিশুসাহিত্য এমন এক মনন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় যা লেখকের জন্য শ্রমসাধ্য হলেও তার প্রকাশ সাবলীল ও প্রাণবন্ত, শ্রম, চেষ্টা ও প্রতিভার সমন্বয়ে সৃষ্টি হতে পারে এমন অভাবনীয় সাহিত্য।

আমরা যারা শিশুসাহিত্য কর্মী, আমাদের দায়বদ্ধতা কী?

শিশুর প্রতি ভালোবাসা শিশুসাহিত্য রচনার পূর্বশর্ত। শিশু যে কোনো জিনিস দেখলে ধরতে চায়, ছুঁতে চায়। ওরা খেলতে চায়। টেলিভিশন দেখতে চায়। তাদের আগ্রহ ও আনন্দের জায়গাটুকু খবর রাখতে হয় আমাদের। বলা যেতে পারে, শিশু মনস্তত্ত্ব আয়ত্ত করে নেওয়া জরুরি। শিশুসাহিত্য যেন শিশুর আনন্দসঙ্গী হয়ে ওঠে, তার জন্য আমাদের ভাবতে হবে সব সময়।

শামসুজ্জামান খান তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন : শিশু সাহিত্য শিশুর মানসিক খাদ্য। এই খাদ্য তার মনকে করে সতেজ, সবল। তার স্বপ্ন ও কল্পনাশক্তির বিকাশে উপভোগ্য শিশু সাহিত্যের কোনো বিকল্প নেই। মুক্তমন, উদার চিন্তা, স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ, এই সবকে গড়ে তোলে অদ্ভুত, বিস্ময়কর, অসামান্য বই। একথা ঠিক শিশু সবচেয়ে বেশি শেখে তার পরিবেশ থেকে, পরিবার থেকে, তার নিজস্ব জগৎ থেকে। দয়া, মায়া, বন্ধুতা, প্রতিবেশী ও অন্য মানুষকে ভালোবাসা এই বিষয়গুলো পরিবেশ থেকে প্রকৃতি থেকেও বুঝে মানুষ শিখে নেয়। সেই শিখে নেয়ার ওপর একটি স্থায়ী প্রলেপ দিয়ে দেয় আনন্দ, আবেগ ও গভীর মনোসংযোগে পড়া প্রিয় বইটি। এভাবে মা-বাবা ছাড়াও বইয়ের কোনো কোনো চরিত্র হয়ে ওঠে শিশুর আদর্শ নায়ক, বীর বা মানসসঙ্গী। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাও শিশুর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিশু দেশপ্রেমিকতার শিক্ষা পায় এবং দেশকে ভালোবেসে ধীরে ধীরে ভালোবাসতে শেখে সারা পৃথিবী ও তার নানা বর্ণের, নানা গোত্রের বিচিত্র মানুষকে-তাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে।

তাই এমন রচনা আমরা চাই, যা শিশু-কিশোরের মানস গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। ছোটোদের রুচি গঠন ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়ক এমন রচনাই আমাদের কাম্য। আমরা জানি, মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে রয়েছে তার রুচি। এই রুচিকেই সবার আগে প্রাধান্য দেয়া দরকার। কামিনী রায় বলেছেন, ‘কুসাহিত্য , কু-দৃশ্য মানুষের রুচিকে বিকৃত করে। সাহিত্য যখন ভবিষ্যৎ সমাজের জীবনকে গঠন করে তখন এরূপ কুসাহিত্যিকে উৎসাহ না দেয়াই উচিত। যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক,

যাহা জনকে ঊর্ধ্বমুখ করে, তাহাই আর্ট।' আমাদের দরকার তেমন মানসম্মত বই, যা ছোটোদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কেমন হওয়া উচিত বইগুলো? সত্যজিৎ রায়ের মতে: 'লে-আউট, ছাপা, ছবি যেমন সুন্দর হওয়া দরকার, তেমনি এর লেখাগুলোও হবে শিশু-কিশোর মনের উপযোগী।' ছোটোদের লেখার একটি প্রধান ও প্রচলিত সংজ্ঞা হলো, এটি সববয়সী পাঠক পাঠিকাকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে। অজিত দত্ত বলেন, 'ছোটোদের বই এমন হতে হবে যা তাদের ভালো লাগবে আর যা পড়ে তাদের মনের ভালো বৃত্তিগুলোতে খানিকটা সাড়া জাগাবে।' ছোটোদের মন ও মনন গঠনে শিশুসাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্বে ছোটোদের চিন্তা-চেতনায় রুচিবোধ ও জীবনবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা একান্ত আবশ্যক।

শিশু সাহিত্য নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ

অনীক রায়হান :

আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা আছে যে, সব বাঙালিই বয়ঃসন্ধিতে এক আধটা কবিতা, চিঠি ইত্যাদি লিখে থাকে। প্রচলিত এ ধারণাটির প্রকৃত উৎস কী, তা নিজের মধ্যেও বেশ কিছুদিন আলোড়িত হয়েছিল। ঘটনা প্রসঙ্গে একদিন শ্রদ্ধেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়, কারণটা কী? সুনীলদা উত্তর দিয়েছিলেন যে আসলে আমাদের শিশুসাহিত্য খুব শক্তিশালী।

আমাদের শিশু সাহিত্য শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যময় বলেই আমাদের ভিতর এক ধরণের সাহিত্যবোধ দেখা যায়। হয়তো বাঙালির সাহিত্যমনস্কতার নেপথ্যে শিশু সাহিত্যের এ ভূমিকাটি অন্যতম, মেনে নিতে দ্বিধা নেই। অথচ, আশ্চর্যরকমভাবে শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা অবহেলিত, খানিকটা দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্যিক বলেই তাদের গণ্য করা হয়। কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রমী নাম স্মরণে রয়েছে আজ। আশ্চর্য এ উপেক্ষিত অবস্থানটিকে নিয়েই ক োজ করার একটা ইচ্ছে ছিল দীর্ঘদিন ধরে। শিশুসাহিত্যের জন্য এক সময়ে যাঁরা প্রাণপাত করেছেন, প্রাক স্বাধীনতা পর্বে তাঁদের মহৎ প্রয়াস ও উদ্দেশ্যকে বিনম্র শ্রদ্ধায় একবার ফিরে দেখার তাড়নায় বলাকা সাহিত্য পত্রিকার এ প্রয়াস।

শিশুসাহিত্য শব্দটি নিয়ে আলোচনা কম হয়নি বাংলা সাহিত্যে। কারা শিশু, কাদের জন্যই বা লেখা আর কারাই বা শিশুসাহিত্যিক, এ নিয়ে আজও বিভিন্ন ধরণের মত সক্রিয়। 'শতাব্দীর শিশু–সাহিত্য' গ্রন্থে খগেন্দ্রনাথ মিত্র নিজস্ব মতামত দিয়ে লিখেছিলেন, 'আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকেই শিশু–সাহিত্য বলার পক্ষে'। এ বিষয়ে বয়স অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগের পক্ষপাতী কেউ কেউ। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মিশুসাহিত্য সম্পর্কে এ মত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আরেকটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে যে, শিশুসাহিত্য অন্য একটি ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়। শিশু–কিশোর বয়সে যে আনন্দ ও কৌতূহল নিয়ে বিষয়টিকে দেখা হয়, বড় বয়সে সেই বিষয়টি ভাবনার সাম্রাজ্য খুলে দেয়। সুকুমার রায় বা রবীন্দ্রনাথের এমন রচনা প্রচুর। তাই শিশু–সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট কোনো পাঠককে না বুঝিয়ে বরং বলা ভালগু যাদের ভিতর চিরকালের একটা চলমানতা থাকে; তাদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশু সাহিত্য বলে বিবেচিত হতে পারে। সব বড়দের ভিতরে যে ছোটবেলা থাকে, সেই ছোটবেলার জন্যই শিশু–সাহিত্যের জন্ম। তাকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ; কিন্তু পরিধিটি ক্রমবর্ধমান, যে গ্রহণ করতে পারবে তারই। তাই শিশুসাহিত্য সময় ও স্থানের ভিতর তৈরি হওয়া একটি বহুমাত্রিক সম্ভাবনা। যা নিজে জেগে থাকে, অন্যকেও জাগিয়ে রাখে।

এক সময় পাঠ্যবই থেকে সরে এসে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব পথ তৈরি করছিল। নীতিশিক্ষামূলক গল্পের সৌধ থেকে ছড়িয়ে গেল সাহিত্যের অন্য ভুবন। মূলত, বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর থেকেই শিশু-সাহিত্যে ভিন্ন একটি জগৎ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠ্যবই-এর বাইরে দাঁড়িয়ে শিশুদের জন্য এমন ভাবনার কথা অবশ্য হরিনাথ মজুমদার ভেবেছিলেন সেই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দেই। বিজয়বসন্তের আত্মপ্রকাশ সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, যদিও ভাষা ও অন্যান্য অনেক কারণেই বিজয়বসন্ত পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে যথার্থ অর্থে শিশুদের জন্য সম্পূর্ণভাবে রচিত এ কথা বলা যায় না। তবু বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আভাস দেখা গেল, যদিও তা ছিল বিদ্যাসাগরের তিরোধানের প্রায় তিরিশ বছর আগে। বালক-বালিকাদের জন্য সেই সময় যে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার নাম 'সখা'। সখা মাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকাটির প্রকাশ বাংলা শিশু-সাহিত্যের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদনা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। পরবর্তীক্ষেত্রে এ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা গেল শিশু সাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে। এ সময়টি ছিল বাংলা শিশু-সাহিত্যের যথার্থ উন্মেষপর্ব। কারণ, এর পরই আত্মপ্রকাশ করে 'বালক', 'সাথী', 'মুকুল', 'সন্দেশ', 'মাসপয়লা', 'মৌচাক' ও অন্যান্য আরও অনেক অনেক পত্রিকা।

এ সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর দিতেই দেখা গেল যে, ১৮৮৩তে ঢাকা থেকে 'বালিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার গুপ্ত। যে সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে 'বালিকা' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটা জাগরণ বলা যায়। যদিও এ পত্রিকাটির প্রকাশিত সব সংখ্যা আর প্রায় কোনো গ্রন্থাগারেই নেই। এ ভাবেই বাংলা শিশু-সাহিত্যের জগৎ ক্রমশ বিস্মৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দেখা গেল, প্রবাদপ্রতিম সেই সব মানুষেরা লিখে চললেন শিশুদের জন্য এক নাগাড়ে। স্পষ্ট হয়ে উঠলেন বঙ্গ শিশু-সাহিত্যে অনেকেই। প্রকাশিত হতে লাগল একের পর এক পত্রিকা। বেরোতে লাগল শিশুদের জন্য রচিত গ্রন্থ। কারও রচনা বেরোতে লাগল শুধু পত্রিকাতেই, গ্রন্থ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি সেগুলো। হয়তো আজকের নিরিখে তারা খানিকটা অস্পষ্ট বা গৌণ থেকে গেলেন। বাঙালি পাঠক পেয়ে গেল রূপকথার সাম্রাজ্য। আমাদের ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ধরেই বাঙালির শিশু সাহিত্যে এসে গেল ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝোলা, ঠাকুরদাদার ঝোলা ইত্যাদির সম্ভার। মনের দিগন্তে তখন রূপকথার মেঘ। শিশু সাহিত্যের এ ধারা ক্রমশ ছড়িয়ে গেল। আর তারই সঙ্গে উঠে এল একটি বিশেষ ধরণের রচনাসম্ভার, যেখানে শিশুকে উদ্দেশ্য করেই তৈরি হল সাহিত্য, অথচ ভিতরে থেকে গেল আরও কয়েকটি স্তর। যে স্তরগুলো শিশুবেলা অতিক্রম করেও অমলিন। বিভিন্ন বয়সের পালতোলা নৌকাযাত্রা। সুকুমার আর রবীন্দ্রনাথের হাতেই যেন 'সময়' নতুন একটা ধারণা পেল। তৈরি হয়ে গেল বাঙালির শিশু সাহিত্যের ভিন্ন এক ভুবন। অসম্ভব ভাললাগার মনটি শৈশব উত্তীর্ণ করলেও বেরোতে পারল না সুকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজনের সময়োত্তীর্ণ সাহিত্য থেকে। শুরু হয়ে গেল নীতিশিক্ষা ও রূপকথার বাইরে দাঁড়িয়ে টাইম ও স্পেসের অসম্ভব এক সাহিত্যজাত ধারণা। বাঙালির শিশু সাহিত্য যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। এ সংখ্যায় সেই সময়টিকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে বিষয়গতভাবে এবং শিশু-সাহিত্যের মুখ্য ও গৌণ লেখকদের কর্মজগতকেও ধরা হল বিভিন্ন রচনায়। এমন একটি বিষয়ে চোখ রাখতেই নজরে এল আশ্চর্য একটি ঘটনা। ১৯৩৬-এ 'অজানার উজানে' নামক একটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসটির জন্ম-ইতহাস অভিনব। এ প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ মিত্র তার গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'এরূপ উপন্যাস পূর্বে ও পরেও বাংলার শিশু-সাহিত্যে আর রচিত ও প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। উপন্যাসখানি দ্বাদশজন লেকক রচনা করেন...।' 'অজানার উজানে' উপন্যাসটি ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টচার্য সম্পাদিত 'মাসপয়লা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। রচনাটি শুরু করেছিলেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শেষ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বারোজনের মধ্যে আর দশ জন হলেন, শোভনলালা গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন সাহা, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবিনয় রায়চৌধুরী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সময়ে। বাংলা সাহিত্যেই বোধহয় এমন উল্লেখযোগ্য ঘটেছে যে, বারোজন শিশু-সাহিত্যিক মিলে ধারাবাহিক একটি প্রয়াস সেই সময় সুচিত করেছিলেন। পরে আর তেমন কোন যৌথ বা সমবেত প্রয়াসের খবর তৈরি হয়নি।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ শিশু-সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল। শিশুদের পত্র-পত্রিকায় ছবির জগতেও বিভিন্ন নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশু–সাহিত্য রচয়িতারা তেমনভাবে তবু স্বীকৃতি পাননি, ব্যতিক্রমী দু–এক জন ছাড়া। শিশু–বেলা ফুরিয়ে গেলে শিশু–সাহিত্যিকও যেন দূরে চলে যান, থেকে যান বিশেষ একটি সময়ের রচয়িতা হিসেবে। অথচ আপামর বাঙালির শৈশবে এ সমস্ত রচনাই স্ফুলিঙ্গের মতো ভূমিকা গ্রহণ করে চিন্তাজগৎ নির্মাণে। তবুও তাঁরা স্বীকৃতিহীন অথচ শিশু–সাহিত্যের প্রসঙ্গ বা লোকমুখে প্রচারিত ছড়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনব মন্তব্য করেছেন। তিনি ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করে ‘ছেলেভুলানো ছড়া’য় লিখেছিলেন, ‘আমি ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচারে শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এ দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘে বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু–শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলোও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে মিশু–হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।’

শিশুসাহিত্যের ভাষা

সুজন বড়ুয়া

আমরা সাধারণত যে শব্দগুলো প্রয়োগ করে কথা বলি, লেখকেরা সে শব্দগুলো দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তবু আমাদের প্রতিদিনের ভাষা আর সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা কিন্তু এক নয়। সেটা শিশুসাহিত্য বা বয়স্কজন পাঠ্য সাহিত্য যা-ই হোক কেন? লেখক আমাদের মুখের শব্দগুলো সাহিত্যে প্রয়োগ করেন সত্য, তবে একেবারে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করেন না, সাহিত্যে প্রয়োগের আগে শব্দগুলোকে প্রতিদিনের অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে বিশুদ্ধ করে নেন। বিশুদ্ধ করেন অনুভূতির রঙ ও ছন্দ দিয়ে, হোক তা পদ্য বা গদ্য। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন-

“আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি

আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী।”

তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের অতি পরিচিত সাধারণ শব্দগুলোই কবির অনুভূতির রঙ ও ছন্দে কী অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য পায়! আসলে ভাষার সাহায্যে ভাষার অতীত পদার্থকে শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয় সঞ্চারিত করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা ভাষার মধ্যে দুটো জিনিসের মেলবন্ধন ঘটান। সে দুটো জিনিস হলো গান ও ছবি। শব্দ-সুষমা ও ছন্দ মিল হচ্ছে গানের দিক আর উপমা রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার হচ্ছে ছবির দিক। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য থেকে কিছু অংশ তুলে এনে আমরা গদ্যে সরস চিত্রময়তা সাক্ষাতের স্বাদ নিতে পারি।

“নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন- এই যে আমি!

দু’জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনো তাহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি- ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া ‘ঠুনু-ঠুন পেয়ালা’ ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রæতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন থাকিয়া

এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাতে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন আমার একপাটি পাম্প?”

শরৎচন্দ্রের এই যে সরস চিত্ররূপময় বর্ণনা- এটা তিনি আমাদের প্রতিদিনের শব্দ দিয়েই করেছেন। কিন্তু লেখায় ব্যবহারের আগে আটপৌরে পোশাক ছাড়িয়ে অনুভবের আওয়ায় তুলে তিনি বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন শব্দগুলোকে। শব্দকে বিশুদ্ধ করার উপরই নির্ভর করে লেখকের সফলতা-ব্যর্থতা। বিশুদ্ধ করতে গিয়ে যে লেখক ভাষাকে সাধারণের মুখ থেকে বেশি দূরে সরিয়ে না নেন, তিনিই সফল লেখক। বয়স্কজনপাঠ্য এবং শিশুসাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য।

কিন্তু শিশুদের জন্য আলাদা সাহিত্য কেন চাই? চাই এ জন্য যে, বড়দের সাহিত্য শিশুদের পক্ষে সহজপাচ্য নয়। গুরুপাক খাদ্য তো বড়দের জন্যই সংরক্ষিত। তা হলে শিশু-কিশোরদের খাদ্য কী; মানে তারা কী পড়বে? বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্বজ্জনেরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমাদের শিশুসাহিত্যের দ্বারোন্মোচন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্বনন্দিত সাহিত্য-মনীষীরা পর্যন্ত শিশুসাহিত্য রচনাকে অবশ্য কর্তব্যজ্ঞান করে শিশুমনোবিকাশের নানা দিক নিয়ে ভেবেছেন।

এখন সাধারণত শিশুসাহিত্য বলতে আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত উভয় সাহিত্যকেই বুঝি। তবে আট-দশ বয়সী শিশুদের শব্দ সঞ্চয়, গ্রহণ ক্ষমতা ও বোধবুদ্ধি যতটা, এগারো-ষোলো বছর বয়সী কিশোরদের সেসবই বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফলে একেবারে শিশুদের জন্য রচিত ভাষাশৈলী, প্রকরণ ও পরিবেশন-ভঙ্গি এবং কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্য সেগুলোর তারতম্য ঘটবেই। অবশ্য আগের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রযুক্তিগত কারণে একালের শিশু-কিশোরদের শব্দ ভাণ্ডার যে বেড়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। সে যাই হোক, আমাদের দেশে একেবারে শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের পরিমাণ অল্প, অধিকাংশই কিশোর-সাহিত্য। শিশু-কিশোর সাহিত্য বয়স্করাও পড়ে থাকেন, তাদের ভেতরেও এক শিশুমন থাকে যে মনটি এ সাহিত্য থেকেও রসদ পেয়ে যায়, কিন্তু বয়স্কদের সাহিত্য শিশু-কিশোরদের গ্রহণযোগ্যতার বাইরের ক্ষেত্র। কেবল আদিরসটুকু বাদ দিয়ে লিখলেই শিশুসাহিত্য হয়ে ওঠে না, মনস্তাত্তি¡ক কারণেই ভিন্নতা অপরিহার্য, তা ছাড়া ভাষাবিন্যাসের ব্যাপার তো রয়েছেই। সারাজীবন শুধু শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন- বাংলা ভাষার এমন লেখক অবশ্যই আছেন, কিন্তু সংখ্যায় তারা বেশি নন। যারা বড়দের জন্য লেখা লিখেই জনপ্রিয়, অধিকাংশ কিংবা বলা যায় সেরকম সকল লেখকই ছোটদের জন্য কম-বেশি লিখে এসেছেন। কিন্তু দুই শ্রেণির লেখককেই খেয়াল রাখতে হয় কাদের জন্য লিখছেন এবং তখন ভাষা-ব্যবহারের দিকটি অবশ্যই প্রাধান্য পায়। তবে এর পৃথক কোনো ভাষা নেই, দেখা যায় প্রত্যেক লেখকই, ছোটদের জন্য যখন লিখছেন, তখন নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করে নিচ্ছেন- এ এক নিজস্ব শিল্পশৈলী নির্মাণ। তাই সেই স্টাইলের বৈচিত্র্যের সীমাও নেই। সাবলীল ও গতিময় ভাষা, ছোট ছোট বাক্য। বয়সোপযোগী শব্দসম্ভার এবং বাক্যের পর বাক্যে ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তোলা, একদিকে কৌত‚হল জাগিয়ে রাখা, অন্যদিকে এক বিস্ময়ের জগৎকে উন্মোচিত করা- শিশুমনকে ছুঁতে হলে শিশুসাহিত্য রচয়িতাকে এসব মাথায় রাখতেই হয়। সাহিত্য রস তো শিল্পসম্মত হওয়া চাই, শিশু-কিশোররা ছোট বলে তাদের অবোধ-অপরিণত ভাবলে চলে না, তারা আদৌ তা নয়, আবার অতিবোদ্ধাও নয়, তারা যাই তাই, সে কারণে তাদের জন্য সাহিত্য হওয়া চাই তাদের মনমতো।

শিশুসাহিত্য সৃষ্টির এই বিশেষ দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা। তাই শিশুশিক্ষার আদলেই শুরু হয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্য। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের কথা। শিক্ষা বলতে তখন বর্ণমালা, কিছু শব্দ গঠন ও উপদেশাত্মক রচনা ইত্যাদি। মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে এর সূচনা হলেও বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফসল ফলতে শুরু করল। তবে সবই সাধুভাষায়, কেননা চলিতভাষা সাহিত্যে এল অনেক পরে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, যিনি ‘শকুন্তলা’ লিখেছেন, ‘এইরূপে কৌত‚হলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন।’ সেই তিনিই ‘বর্ণপরিচয়’

প্রথম ভাগের ১৯ পাঠে লিখছেন, ‘গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভালো খাব ভালো পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।’ কিংবা ‘বর্ণপরিচয়’ দ্বিতীয় ভাগে সুশীল বালক, নবীন, মাধব, পিতামাতা, চুরি করা কদাচ উচিত নয় প্রভৃতি গল্পরসে সিক্ত গদ্যগুলোতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন, বাক্যগুলো হয়েছে ছোট-ছোট। বয়সের অনুপাত কতখানিই না ভাবতেন তিনি! সমসাময়িক মদনমোহন তর্কলঙ্কারের ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল’ প্রভাত-বর্ণনার একটি সুন্দর কবিতা, এতে সাধু ক্রিয়াপদ থাকলেও শিশুদের গ্রহণ করতে অসুবিধে হয় না। তবে কিনা নীতিশিক্ষা প্রচ্ছন্ন রেখে সাহিত্যরসের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রিত হতে শিশু-কিশোরদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রযুগ থেকেই তার ক্রমবিকাশ।

আমাদের শিশুসাহিত্য লোকসাহিত্য থেকেই উৎসারিত। পদ্যের ক্ষেত্রে যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘খুকুমণির ছড়া’ তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ আমাদের শিশুসাহিত্যের প্রাতঃস্মরণীয় বই। বিষয়ে বর্ণনায় ভাষায় এ যে অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘এত বড়ো স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর কী আছে?’ দক্ষিণারঞ্জনের এসব বইয়ের ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো- গল্পগুলোতে তিনি লোকভাষাকে যেন অবিকল তুলে এনেছেন, যদিও তা সাধুভাষায় লেখা। যেমন ‘শঙ্খমালা’ গল্পের একটু অংশ- ‘বেলা বাড়ে বেলা উজায়, গাছের মাতা মর্মরিয়ে শুকায়; আর-আর দিন কাঠুরিয়া ইহার কত আগে কাঠের বোঝা আনিয়া দাওয়ার উপরে নামায়, আজ কাঠুরিয়া এতক্ষণও কেন আসে না? না, বেলা ক্রমে আরও বাড়িল,- ময়ূর-ময়ূরী পাখা ছাড়িল, শালিক-শারী ধূলি¯œান করিল, তখন কাঠুরানী, ব্যস্ত হইয়া ভাতের হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া ঝাঁপের দুয়ারে নিমগাছের ডালখানা পুঁতিয়া থুইয়া এক-কলসি কাঁখে এক-কলসি হাতে বাহির হইল।’ সুরেলা ছড়া কেটে কথা বলার গ্রামীণ ধরনও কোনো কোনো গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘সাত ভাই চম্পা’ ছাড়াও অন্য অনেক গল্পেও ভাষার এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

শিশুসাহিত্যের এই ভাষা বৈশিষ্ট্য আমরা পাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘টুনটুনির বই’তেও। গল্প বলার লোক ভঙ্গিটাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রয়োগ করেছেন তাঁর ভাষায়। যেমন-

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দেয়া হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় তার লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিল, আর ভাবলে, ‘ইস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!’

তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে , আর বলে-

রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরেও সে ধন আছে!...

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ ও টুনটুনির বইয়ের পর বাংলা শিশুসাহিত্যে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের ‘ডালিম কুমার’। জাদুকরী ভাষার এমন মোহনীয় বই বাংলা শিশুসাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। শিশুসাহিত্যের আধুনিক ভাষা বিন্যাস ও শব্দ চয়ন নিয়ে আমরা যতই চমক সৃষ্টির চেষ্টা করি না কেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জসীমউদ্দীনকে অতিক্রম করা সহজ নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁরাই অগ্রপথিক।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের জনপ্রিয় লেখকদের ভাষাশৈলীতেও আমরা এই ধারা লক্ষ করি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, আলী ইমাম, আমীরুল ইসলাম থেকে শুরু করে তারুণ্যের প্রতিনিধি আহমেদ রিয়াজ পর্যন্ত সবারই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কথ্যভঙ্গি। কথ্যভঙ্গি লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তৈরি করে দেয়; অনেকটা বক্তা ও শ্রোতার মতো। সুতরাং ভাষা ব্যবহারে কথ্যরীতির অনুসরণ যে কোনো লেখকের পবিত্রতম কাজ। এ কাজটি হয়ে আসছে শিশুসাহিত্যের একেবারে সূচনা-পর্ব থেকে। আজো এই ধারা বহমান।

বাঙালির সৃষ্টি ভুবনে শিশু মানস

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

লীলা মজুমদার আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন যে সুকুমার রায় ভুল সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর মনে হয়েছিল 'ঐ সময়ে সুকুমারের জন্য দেশটা প্রস্তুত ছিলনা' । ছোটদের জন্য যে সাহিত্য রচনা বিগত দেড়শ' বছর ধরে হয়ে আসছে তাকে আমাদের সাহিত্য আলোচকরা কেন সাহিত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন সে এক রহস্য । বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিশু সাহিত্যের কোনো উল্লেখ নেই । সেই পাঠ্য ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুজলেও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার , কিংবা সুকুমার রায় সম্পর্কে একটা অক্ষরও খুজে পাওয়া যাবে না । অথচ ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির গল্প , আবোল তাবোল পড়ে বড় হইনি এমন বাঙালি খুঁজে পাবো না ।

লীলা মজুমদার এই আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জেঠতুতো দাদা সুকুমার রায়ের জন্ম শতবর্ষের স্মৃতি চারণে । তারপর ২৫টা বছর কেটে গেছে । আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বিন্যাশ বদলে গেছে – বদলে যাচ্ছে এবং সেই বদলের প্রক্রিয়াতেই চুরি হয়ে গেছে আমাদের সন্তানের শৈশব । এখন আর 'বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ' ওঠে না , 'শোলক বলা কাজলা দিদি'রাও আর নেই । সে আর ঘুমাতে যায় না 'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির' গল্প শুনে । শৈশব নেই , সুতরাং শিশুসাহিত্যও নেই ।

আধুনিক কবিযশ প্রার্থী – আমরা, শিশুমনের চিরন্তন খোরাক এই সব ছেলেভোলানো ছড়াকে সাহিত্য পদবাচ্য বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্ত ভাষাচার্য সুকুমার সেন যুগ যুগান্তের ধারাবিকতায় প্রবহমান ছড়া – গান- রূপকথার গল্পকে চিহ্নিত করেছেন 'শিশু-বেদ' বলে । মুণি ঋষিদের মুখে মুখে সৃষ্ট চার খন্ডের বেদ যেমন কোনো এক মানব গোষ্ঠীকে আদি-অনন্তকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত করছে , সে ধ্রুব সত্য বলে মেনেছে , তেমনই রচয়িতার নাম না জানা অথচ সময়ের আদীমতম কালখন্ড থেকে মানুষের মুখে মুখে সৃষ্ট প্রবহমান শিশুতোষ ছড়া-গান-গল্প তো আরো এক বেদ – শিশু-বেদ । সমস্ত মানব গোষ্ঠিরই এই 'শিশুবেদ' আছে, এমনকি যে মানব-গোষ্ঠীর কোনো স্থায়ী সাহিত্য নেই তাদেরও । সর্বদেশে সর্বকালে এই ছেলেমি ছড়া শুনে শুনেই আমরা বড় হয়েছি, জীবনকে জেনেছি, চিনেছি, আমাদের সাহিত্যেরও বীজ হয়ে গেছে এইসব অজস্র লৌকিক ছড়া, রূপকথার গল্প, গান । আর তাই-তো শিশুসাহিত্যের চিরকালিন উপাদান লোক পরম্পরায় প্রচলিত 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই । দেশ-কাল-শিক্ষা-প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নতুন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে – অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে । এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন" ।

বয়ঃক্রম ও মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী শৈশব, বাল্য কৈশোর ইত্যাদি ভাগ করে থাকি । যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিনারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী , সুকুমার রায় প্রমুখের রচনা শিশুমনের খোরাক যোগায় । ঠিক একশ' বছর আগে উপেন্দ্র কিশোর শিশু মনের পত্রিকা 'সন্দেশ' শুরু করেছিলেন ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের কথা মনে । সুকুমার রায়ের যা কিছু সৃষ্টি তা এই সন্দেশ পত্রিকাতেই । বাংলা শিশু সাহিত্যের নিজস্ব কোন চরিত্র তখনো গড়ে ওঠেনি । বলা যায় উপেন্দ্র কিশোরের হাত ধরেই বাংলা শিশু সাহিত্যের একটা স্পষ্ট অবয়ব গড়ে উঠেছিল, হয়েছিল বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ।

শিশু সাহিত্য বলতে আজও আমরা যাদের কাছে ফিরে যাই তারা হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার , সুকুমার রায় এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় রায় পরিবার- সুখলতা, পুন্যলতা, লীলা মজুমদার । তারও আগে, অবশ্যই বাঙালির শেষ আশ্রয় রবীন্দ্র নাথ'এ । শিশু মনকে রবীন্দ্রনাথের মত কেইবা বুঝেছেন তাঁর আগে ? বস্তুত, শিশু সাহিত্য কেমন হবে , তার কল্পনার জগৎটা কেমন, তার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে – ভৃত্য পরিবৃত হয়ে । শিশুমনের শৈশব হারানোর বেদনা তিনি বুঝেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা- নাটকে তাই দেখি অনেক অসামান্য শিশু চরিত্র , তার মনোজগত, কল্পনা জগতের বিশ্বস্ত ছবি । পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'ছেলেটা' কবিতায় তিনি নির্দেশ করেছেন যে শিশুর নিজের জগতটাকে তার চোখে, তার মত করে না দেখলে তাদের ভালোলাগার কবিতা –গল্প হতে পারেনা । লিখেছেন –

"থাকতো ওর নিজের জগতের কবি
তাহলে গুবরে পোকা এতো সুস্পষ্ট হ'ত তর ছন্দে
ও ছাড়তে পারতোনা
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথা কি পেরেছি লিখতে ?
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি !"

শিশু তার নিজের জগতের কথাকার পেয়েছিল – দক্ষিনারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়ের মধ্যে । স্বাধীনতা উত্তর কালে প্রেমেন্দ্র মিত্র , শিবরাম চক্রবর্তী , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা সত্যজিৎ রায় প্রমুখের রচনাগুলি কিশোর সাহিত্য, কিশোর বয়ঃক্রমের চাহিদা অনুযায়ী লেখা, সেগুলি এ নিবন্ধের আলোচ্য নয় । স্বাধীনতা উত্তর কালে শৈলেন সরকার প্রমুখ শিশু মনের গল্প-কবিতা লিখেছেন সত্য, কিন্তু চিরন্তন শিশু সাহিত্যের সন্ধান করতে আজও আমাদের যেতে হয় উপেন্দ্র কিশোর –দক্ষিনা রঞ্জন – সুকুমার- এই ত্রয়ীর কাছে ।

উপেন্দ্রকিশোর মূলত গদ্যই লিখতেন । শিশু মনের গল্প আর সেইসঙ্গে ইতিহাস, পুরান, বিজ্ঞান ও প্রাণীতত্ব প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলির রমনীয় ভঙ্গিতে শুনিয়েছেন শিশুদের – তারা সেই প্রথম সাহিত্যের স্বাদ পেতে শিখেছিল উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকেই । শুধুমাত্র ছোটদের জন্য যে পত্রিকা 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবদ্দশার ও পরবর্তী সময়ে, শিশু সাহিত্যের এক লেখক গোষ্ঠী - শিশু সাহিত্যের আশ্চর্য লেখক পরিবার - উপেন্দ্র কিশোর – সুকুমার-সুখলতা- পূণ্যলতা- কুলদা রঞ্জন-প্রমদা রঞ্জন – লীলা – সত্যজিৎ ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার শিশু সাহিত্যের এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা, শিশু মনে রূপকথার কল্প-জগতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং শিশু মানসে এক উদ্ভট কল্প-জগতের সৃষ্টি করে শিশু সাহিত্যের যে অপরূপ বৈভ্ তাতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সাহচর্য ছিল । বস্তুত ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য- সঙ্গীত- শিল্প চর্চাই উপেন্দ্রকিশোরকে অনুপ্রাণীত করেছিল ঠাকুর বাড়ি থেকে তখন প্রকাশিত হ'ত 'বালক', পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকা । ঠাকুর বাড়ির এই সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশই তাঁকে উদবুদ্ধ করেছিল, আর বাঙালি পেয়ে যায় শিশুমনের প্রাণের মানুষ অদ্বিতীয় শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরকে । এমনকি উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম গ্রন্থ 'ছেলেদের রামায়ণ'এর পান্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । পুস্তকটির ভূমিকা থেকে আমরা একথা জানতে পারি।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ । তাঁর চেয়ে ষোল বছরের কনিষ্ঠ দক্ষিণারঞ্জনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের আশির্বাদ ছিল । উপেন্দ্র কিশোর সরস ভাষায় পশু-পাখী, বাঘ-ভাল্লুকের গল্প শোনালেন আর দক্ষিণারঞ্জন শিশুমনকে রূপকথার কল্প-জগৎ'এ নিয়ে গেলেন আর সুকুমার রায় সৃষ্টি করলেন শিশুমনের অজানা এক উদ্ভট জগৎ । দক্ষিণারঞ্জন বাঙ্গালির চিরায়ত শিশু সাহিত্য 'ঠাকুরমার ঝুলি' লিখেছিলেন আজ থেকে ১০৫ বছর আগে । আমার কাছে বইটির যে সংস্করণ আছে সেটি ২৯তম সংস্করণ, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮০তে । তখন পর্যন্ত ঠাকুরমার ঝুলির বিক্রয় সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার । তথ্যটি দেওয়া এইজন্য যে এ থেকে বোঝা যায় কি বিপুল জনপ্রিয় বাঙ্গালির শিশু সাহিত্যের এই সোনার খনিটি । দক্ষিণারঞ্জন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন নীলকমল-লালকমল , বুদ্ধু-ভুতুম , কাঞ্চনমালাদের কথা ? তাঁর নিজের কথায় "মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম...মা'র মুখের অমৃত-কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিতঃ পরে কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার ময়ূখে আবার যাহা শুনিতে শুনিতে শিশুর মতো হইতে হইয়াছিল ..."। উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে , আর বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । যেখানে তিনি লিখেছিলেন "...ইহার উৎস বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে । যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে। নিখিল বঙ্গের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত । অতয়েব বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে – তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে – সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া তোলে"। রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ থেকেই আমি বুঝতে চেয়েছি বাঙ্গালির চিরায়ত শিশু সাহিত্যের স্বরূপ ও তার লোকপ্রিয়তার সূত্রটি ।

মৃত্যুর ২বছর পূর্বে উপেন্দ্রিকিশোর শুরু করেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশনা । ঐ বছরই পুত্র সুকুমার লন্ডন থেকে মুদ্রণ প্রযুক্তিতে উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করে , এদেশের প্রথম 'ফেলো অফ রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি' শিরোপা নিয়ে দেশে ফেরেন ও 'সন্দেশ'এ লেখা, ছবি আঁকা ও অন্যান্য কাজে নিবিড় ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । পিতার মৃত্যুর পর তিনিই 'সন্দেশ'এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । এই নয় বছরে (শেষ আড়াই বছরের শয্যাশায়ী অবস্থা সহ), সুকুমার লিখেছিলেন ১০৩টি কবিতা, ৮৮টি নানা ধরণের ছোট গল্প, ১২২টি প্রবন্ধ, ৮টি নাটক ও ২টি বড় গল্প আর এঁকেছিলেন পত্রিকার সমস্ত ছবি । সুকুমার রায়ের কনিষ্ঠ খুড়তুতো ভগ্নী শিশু সাহিত্যের দিকপাল, প্রয়াতা লীলা মজুমদার আক্ষেপ করেছিলেন "এখন মনে হয়, ঐ সময়ে সুকুমারের জন্য এ দেশটা প্রস্তুত ছিল না" । তাঁর আক্ষেপের কারণ আছে, এবং আমাদেরও । সুকুমার রায়ের সমকালীন আলোচক বৃন্দ তাঁকে 'ছোটদের জন্য হাসির কবিতা লেখেন' এর বেশি মর্যাদা তাঁকে দেননি । লীলা মজুমদারের জিজ্ঞাসা ছিল " কোনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিশু সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হতনা, সেটাই কি কারণ"? এই আক্ষেপ আমাদেরও । আজও আমরা তাকে 'ননসেন্স লিটারেচর'এর আশ্চর্য শ্রষ্টার বেশি জানিনা । জানিনা যে তিনি হাফটোন মুদ্রণ পদ্ধতির অন্যতম পুরোধা, একাধিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন । জন্মের একশ'পঁচিশ বছর পরেও বাংলা শিশু সাহিত্যে সুকুমার রায়ের অবদান অমলিন হয়ে আছে – নিশ্চিতভাবেই থাকবে আরও বহুদিন ।

একটা মূলত কবিতার পত্রিকা যখন সুকুমার রায়কে ১২৫তম জন্মবর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তখন আশা জাগে, প্রত্যাশা করতে ইচ্ছা হয় – হয়তো বা বাংলার শিশু সাহিত্যের অতীত গৌরবকে স্মরণে রেখে বাংলার শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পাবো । আগামী বছরের প্রথমার্ধেই আমাদের শিশু সাহিত্যের প্রাণপুরুষ উপেন্দ্র কিশোরের সার্ধ-শতবর্ষ পূর্তি , এ বছর সুকুমার রায়ের একশ'পঁচিশতম জন্মদিন পেরিয়ে এলাম ,আগামী বছরের প্রথমার্ধে উপেন্দ্রকিশোরের সার্ধ-শতবর্ষ পূর্তি আর ছোটদের প্রাচীনতম পত্রিকা 'সন্দেশ'এর শতবর্ষ পূর্তি । নিশ্চিত ভাবেই বাঙ্গালির শিশুসাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে । সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন "যে শিশু ভুমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে....../এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি --/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার" । এই প্রজন্মের আমরা ছড়া - গল্প-কবিতা – গানে শিশুমনের কাছে পৌছাতে পারলে সেই অঙ্গীকার পালনে কিছুটা অংশভাগী হতে পারি ।